"দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত"

Subject:RAM 302
Submitted To:Ustaz Abdul Wahid

Submitted by:Afrin Alam Momo
Roll:20202115;6th Semester
Date:10/06/23



সূচিপত্র:

ভূমিকা:

দ্বীনী ইলম ছাড়া জাতিকে পথ প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। যখন কোন জাতি অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে, তখনই আল্লাহ ঐ জাতির নিকট একজন নবীকে ওহীর জ্ঞানসহ পাঠিয়েছেন। জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা লুটতরাজ, রাহাজানি, গোত্রকলহ, যেনা-ব্যভিচার সহ যাবতীয় অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগীতে পর্যায়ক্রমে ওহীর জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষদেরকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলেন। বর্তমান বিশ্বে সূদ, ঘুষ, খুন, ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানি, যেনা-ব্যভিচার, হরতাল-অবরোধ, গুম ইত্যাদির জয়জয়কার চলছে। তথাকথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে মানুষ আজ বিভীষিকার মধ্যে নিমজ্জিত। এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হল প্রকৃত শিক্ষা। নিম্নে দ্বীনি ইলম বা শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব ও ফজীলত সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

ইলমের সংজ্ঞা :

‘ইলম’ আরবী শব্দ العلم মাছদার থেকে উৎকলিত। অর্থ الادراك والمعرفة **বুঝা, উপলব্ধি করা। পারিভাষিক অর্থ,**

هو نور يقذفه الله فى قلب من يحبه يعرف به حقائق الاشياء وغوامضها

‘এটা এমন আলো, যা আল্লাহ তাঁর প্রিয় মানুষের অন্তরে ঢেলে দেন। অতঃপর তিনি তা দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব ও রহস্য জানতে পারেন’।

`OXFORD dictiornary’-তে ইলম বা জ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, `The information, understanding and skills that you gain through education or experience’.

দ্বীনী ইলমের গুরুত্ব :

আল্লাহ কর্তৃক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জিবরীল মারফত সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশকৃত শব্দ হল, اِقْرَأْ ‘আপনি পড়ুন!। রাসূল (ছাঃ) তখন বলেছিলেন, أَنَا بِقَارِئٍ ‘আমি পড়তে জানি না’। তখন জিবরীল (আঃ) তাকে জাপটে ধরেছিলেন। এই একই দৃশ্য তিনবার হওয়ার পর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট সূরা ‘আলাক্বের প্রথম

পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়।[1] করুণাময় আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে অহি-র জ্ঞান শিক্ষা দেন। সুতরাং আমাদের সমাজ ও দেশ থেকে অন্যায়, অপকর্ম দূর করতে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। ইলম অর্জনের নির্দেশনা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ **'প্রত্যেক মুসলিমের উপরে জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয।[2]**

দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রতি আল্লাহর উৎসাহ প্রদান :

মানুষ ইলম অর্জন করবে, সে অনুযায়ী আমল করবে এবং নিজেদের মাঝে ইলম প্রচার করবে এটাই আল্লাহর দাবী। আর এ জন্যই আল্লাহ জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

'সুতরাং এমন কেন হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল বের হবে, যাতে তারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আর যাতে তারা নিজ কওমকে ভয় প্রদর্শন করতে পারে যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা সতর্ক হয়' (তওবা ৯/১২২)।

মানুষ অজ্ঞ-মূর্খ হয়ে পৃথিবীতে আসে। আল্লাহ বলেন, عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ **'আমি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছি, যা সে জানত না' ('আলাক্ব ৯৬/৫)। ইলম বা জ্ঞান দ্বারা ভাল-মন্দ নির্ণয় করা যায়। এর দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সুতরাং আল্লাহ যার মঙ্গল চান এবং যার দ্বারা হকের বাস্তবায়ন সম্ভব তাকেই মহামূল্যবান জ্ঞান দান করে থাকেন। যেহেতু জ্ঞানের মালিক আল্লাহ, তাই এই জ্ঞান আল্লাহ যাকে চান তাকে দান করেন। তিনি বলেন,** يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ **'তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন এবং যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় এবং কেবল বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শিক্ষা গ্রহণ করে' (বাকারাহ ২/২৬৯)। এ সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,** مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ **'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন'।[3]**

জ্ঞানী ও মূর্খদের মধ্যে পার্থক্য:

ইলম আল্লাহ প্রদত্ত এক অফুরন্ত নেআমত। যা জ্ঞানী ও মূর্খদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ **'বলুন! যারা জানে এবং যারা জানে না তার কি সমান?' (যুমার ৩৯/৯)। তিনি অন্যত্র বলেন,** قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ **'বলুন! অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি এক হতে পারে?' (রা'দ ১৩/১৬)।**

মহান আল্লাহ সম্পর্কে যারা সঠিক ধারণা রাখে এবং তার শারঈ বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে জানে এবং মেনে চলে তারাই প্রকৃত জ্ঞানী। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ **'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মূলত**

আলেমরাই তাঁকে ভয় করে' (ফাতির ৩৫/২৮)। অন্যত্র তিনি বলেন, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ **'আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্বানগণ (সাক্ষ্য প্রদান করেন)। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' (আলে ইমরান ৩/১৮)। তিনি আরো বলেন,** وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ **'পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় অভিজ্ঞ তারা বলে, আমরা উহার প্রতি ঈমান এনেছি, সবই আমাদের রবের তরফ থেকে এসেছে। সত্য কথা এই যে, কোন জিনিস হতে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই গ্রহণ করে' (আলে ইমরান ৩/৭)।**

আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী :

রক্ত সম্পর্ক কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে কোন ব্যক্তির ওয়ারিস হওয়া যায়। কিন্তু ইলম এমন একটি মূল্যবান সম্পদ, যে ব্যক্তি তা অর্জন করবে আল্লাহ তাকে নবীদের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী বানাবেন। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণাসম্পন্ন ব্যক্তিরা মূলত নবীদের উত্তরাধিকারী। আর উত্তরাধিকার জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

'আলেমরাই নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দীনার বা দিরহামের উত্তরধিকারী করেন না। বরং তারা ইলমের উত্তরাধিকারী করেন। ফলে যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে বৃহদাংশ গ্রহণ করল।[4] অতএব দ্বীনি ইলম অর্জন করলে নবীদের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়

ইলম অর্জনের মর্যাদা :

ইলম অর্জনের মর্যাদা অত্যধিক। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير **'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ যাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত' (মুজাদালাহ ৫৮/১১)। ইলম অর্জনের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,**

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন।[5] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِى عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ.

আবু উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে দু'জন লোকের কথা উল্লেখ করা হলো। যাদের একজন আলেম অপরজন আবেদ। তখন তিনি বলেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর। যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের উপর। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই তার প্রতি আল্লাহ রহমত করেন এবং তার ফেরেশতামন্ডলী, আসমান-যমীনের অধিবাসী, পিপিলিকা তার গর্তে থেকে এবং এমনকি মাছও কল্যাণের শিক্ষা দানকারীর জন্য দো'আ করেন।[6]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَة.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট অহি প্রেরণ করেছেন এই মর্মে, যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের লক্ষ্যে কোন পথ গ্রহণ করবে, তার জন্য আমি জান্নাতের পথ সহজ করে দেব এবং যার দু'চক্ষু আমি অন্ধ করেছি তার বদলে আমি জান্নাত দান করব। আর ইবাদত অধিক করার তুলনায় অধিক ইলম অর্জন করা উত্তম।[7] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ.

'যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা উহা দ্বারা তাকে জান্নাতের কোন একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকরীর উপর খুশি হয়ে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। এছাড়া আলেমদের জন্য আসমান ও যমীনের সকল অধিবাসী আল্লাহর নিকট দো'আ ও প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যে বসবাসকারী মাছও (তাদের জন্য দো'আ করে)'।[8]

জ্ঞানীদের জন্য করণীয় :

জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই করণীয় হল জানা বিষয়গুলো মানুষের নিকট প্রচার করা। যেমন আল্লাহ তাঁর নবীদের নিকট অহি প্রেরণের পর তা মানুষদের নিকট প্রচারের নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه **'হে রাসূল! পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে আপনি তাঁর পয়গাম পৌঁছালেন না' (মায়েদা ৫/৬৭)। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,** بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً **'আমার পক্ষ হতে মানুষদের নিকটে পৌঁছে দাও, যদি একটি আয়াতও হয়'।[9] পক্ষান্তরে আলেমরা দ্বীন প্রচারে অবহেলা করলে কিংবা বিরত থাকলে অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। হাদীসে এসেছে,**

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ بِهِ أَقْتَابُهُ فَيَدُورُ بِهَا فِى النَّارِ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلاَنُ مَا لَكَ مَا أَصَابَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيه.

ওসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে গাধা আটা পিষা যাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদের ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদের ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে করতাম না। আর খারাপ কাজের নিষেধ করতাম কিন্তু নিজেই তা করতাম।[10] অতএব আমলবিহীন ইলম ক্বিয়ামতের দিন বড় শাস্তির কারণ হবে। আরবী প্রবাদে রয়েছে, رجل بلا عمل كشجرة بلا ثمر **‘আমলবিহীন ব্যক্তি ফলবিহীন বৃক্ষের ন্যায়’। জনৈক আরবী কবি বলেন,**

لو كان للعلم شرف من دون التقي* لكان أشرف خلق الله إبليس

‘যদি তাক্বওয়াবিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত, তবে ইবলীস আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হত।[11]

ইলম প্রচারে সতর্কীকরণ :

দ্বীনি ইলম প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রতিটি বিষয় উপস্থাপনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বিষয়টি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী, না পরিপন্থী। কোন মনগড়া কথা উপস্থাপন করা যাবে না। রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে কোন কথা বৃদ্ধি করা যাবে না। কেননা তিনি হুঁশিয়ারী প্রদান করে বলেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ **‘যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।[12] অন্যত্র তিনি বলেন,** مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِين **‘যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে এরূপ কথা বলে, যা সে মনে করে যে, সেটা অসত্য। সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।[13]**

আল্লাহর নিকট উপকারী ইলমের প্রার্থনা করা :

আল্লাহর নিকট ইলমসহ যাবতীয় কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহর নিকট চাওয়ার মাধ্যমে ইলম অর্জিত হলে তা দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই অর্জন করা সম্ভব। আর যদি না চাওয়াতেই ইলম আসে, তা দিয়ে দুনিয়া সম্ভব আখিরাত কখনই অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ **‘অনেকে বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার জন্য পরকালের কোন অংশ নেই’ (বাক্বারাহ ২/২০০)।**

আর এজ্যই নবী রাসূলগণ একমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাইতেন। যেমন ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা করে বলেন, رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِين **'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর' (শু'আরা ২৬/৮৩)। অনুরূপ মুসা (আঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,** رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي- وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي- يَفْقَهُوا قَوْلِي **'হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে' (ত্বহা ২০/২৫-২৮)। আর এরই ধারাবাহিকতায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট উপকারী ইলমের প্রার্থনা করতেন। হাদীসের ভাষায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি ফজর সালাতের পর প্রার্থনা করতেন এ বলে যে ,** اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلا **'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রিজিক প্রার্থনা করছি'।**[22] **সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত একমাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা।**

শিক্ষার্থীদের জন্য করণীয় :

শিক্ষার্থীকে অবশ্যই অধ্যয়নে মনযোগী হ'তে হবে এবং রুটিন মাফিক চলতে হবে। শরীরের প্রতি যত্নবান হতে হবে। জামা-কাপড়, বেডসীট, পড়ার টেবিল ইত্যাদি পরিষ্কার ও গোছালো রাখতে হবে। কোন ছাত্রের স্মৃতি হ্রাস পেলে তার জন্য অতীব জরুরী বিষয় হলো স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর নিকটে তওবা করা। এ বিষয়ে ইমাম শাফেঈর ঘটনা অনস্বীকার্য। ইমাম শাফেঈ তার মুখস্থ না হওয়ার ব্যাপারে স্বীয় শিক্ষককে বলেছিলেন,

شكوت إلى وكيع سوء حفظي- فأرشدني إلى ترك المعاصي

'আমি অভিযোগ করলাম ওয়াকীর (ইমাম শাফেঈর শিক্ষক) নিকটে আমার মুখস্থ না হওয়ার ব্যাপারে, তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, পাপ কাজ ছেড়ে দাও।[23]

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকবৃন্দকে জিজ্ঞেস করবে, যা সে বুঝতে পারবে না। এরূপ কাজ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং জিবরীল (আঃ)-এর মধ্যকার প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা নিতে পারি। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون **'অতএব তোমরা যদি না জান, তবে আহলে যিকরের নিকট থেকে জেনে নাও' (নাহল ১৬/৪৩; আম্বিয়া ২১/৭)।**

শিক্ষার্থীদের বর্জনীয় বিষয় সমূহ :



শিক্ষকদের অবাধ্য হওয়া, তাদের সামনে উচ্চ স্বরে কথা বলা ও রূঢ় আচরণ করা, বড়দের অসম্মান, ছোটদের সাথে খারাপ ব্যবহার, সহপাঠীদের কষ্ট দেওয়া, চুরি-ডাকাতি-ছিনতই-টেন্ডারবাজিসহ যাবতীয় অন্যায় কাজ বর্জন করতে হবে। অপচয়-অপব্যয় থেকে বিরত থাকতে হবে। সেটা সময়, টাকা-পয়সা বা যে কোন বিষয়ে হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا-إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ **'কিছুতেই অপব্যয় কর না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই' (বনী ইসরাঈল ১৭/২৬-২৭)। অসৎসঙ্গ ত্যাগ এবং সৎসঙ্গ গ্রহণ করতে হবে, তাতে দুনিয়াতে মঙ্গল এবং আখেরাতে আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাওয়া যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,** وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ **'দু'জন ব্যক্তি, যারা পরস্পর ভালবাসে আল্লাহর জন্য এবং একত্রিত হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথক হয় আল্লাহর জন্যই।[24]**

ইলম অন্বেষণে হিংসা :

হিংসা করা মহাপাপ। হিংসা করার পরিণতি ভয়াবহ। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَب **'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা হিংসা মানুষের পূর্ণ আমলগুলো বিনষ্ট করে যেমন আগুন কাঠকে ভষ্মিভূত করে।**[25] **ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হিংসা করা জায়েয। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,** لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهْوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا **'কেবল দু'টি বিষয়ে হিংসা করা যায়। এক. সেই ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন অতঃপর তা বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। দুই. সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন অতঃপর সে তার মাধ্যমে বিচার ফায়সালা এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।[26]**

ক্বিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে শিক্ষার অবস্থা :

ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে দুনিয়াবী শিক্ষা বৃদ্ধি পাবে এবং দ্বীনি শিক্ষা লোপ পাবে। মানুষের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাবে। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا ، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا ، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

‘আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম ছিনিয়ে নিবেন না। বরং দ্বীনের আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নিবেন। তখন কোন আলেম অবশিষ্ঠ থাকবে না। যার দরুন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা না জেনে ফতওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[27] **অন্যত্র তিনি বলেন,** إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا **‘ক্বিয়ামতের কিছু আলামত হ’ল, ইলম হ্রাস পাবে, অজ্ঞতা প্রসারতা লাভ করবে, মদ পানের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করবে।**[28

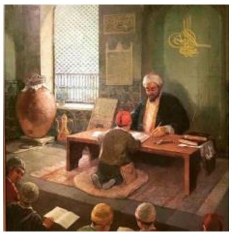
সুশিক্ষার সফলতা :

গোটা বিশ্ব আজ অশান্তিতে পুঞ্জিভূত। এথান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র হাতিয়ার হলো সুশিক্ষা। কেননা সুশিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়াতে যেমন মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও সমাজে শান্তি আসবে, তেমনি আখেরাতের পাথেয় অর্জনের পথ সুগম হবে। মৃত্যুর পর মানুষের আমল বন্ধ হয়ে যায় অথচ দ্বীনি ইলম অর্জন করে শিক্ষা দিলে তা কবরে পৌঁছানোর অন্যতম একটি মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه **‘যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল ব্যতীত। এই তিনটি আমল হলো, প্রবহমান সাদাকা, এমন ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সুসন্তান যে তার জন্য দো‘আ করে।**[29]

তথ্যসূত্র: **https://sothikp.com/2020/08/importance-and-necessity-of-knowledge.html**

ইলম তলবের গুরুত্ব, ফযীলত ও আদব

মাওলানা আহমাদুল্লাহ বিন রুহুল আমীন



ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَا- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। -তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। -মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে। -শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪

ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল। ইমাম বুখারী রাহ. সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ والعمل.

(সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম।)

এই কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহ. বলেছেন, যে আমলের যে হুকুম তার ইলম হাসিল করারও একই হুকুম। অর্থাৎ যেই আমলটি ইসলামে ফরয তার ইলম অর্জনও ফরয। যেটা ওয়াজিব তার ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। যেটা সুন্নত তার ইলম অর্জনও সুন্নত। তদ্রুপ যেটা হারাম তার ইলম অর্জন করা ফরয। যা মাকরূহে তাহরীমী তার ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এককথায় ইসলামের যেই বিষয়টি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ের ইলম অর্জন করাও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ইলম ছাড়া সঠিক আমল কখনোই সম্ভব নয়।

কুরআন-সুন্নাহয় ইলম হাসিল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ



পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-

وَ اَنۡزَلۡنَاۤ اِلَیۡکَ الذِّکۡرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیۡهِمۡ وَ لَعَلَّهُمۡ یَتَفَکَّرُوۡنَ.

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। -সূরা নাহ্ল (১৬) : ৪৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِیۡ بَعَثَ فِی الۡاُمِّیّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَکِّیۡهِمۡ وَ یُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَةَ.

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। -সূরা জুমুআহ (৬২) : ২

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহ ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেন-

يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا.

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৩০

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.-কে বললেন-

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে। -সূরা কাহাফ (১৮) : ৬৬

হযরত মূসা ও খাযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন-

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১১৪

আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْن.

মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়। -সূরা তাওবা (৯) : ১২২

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না। -তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৬৬, ২৬৮

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন–

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ. وَاللهِ لَيُعَلِّمَنّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلّمَنّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقّهُونَ، وَيَتَفَطّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنّهُمُ الْعُقُوبَةَ .

ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না?

আল্লাহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব। -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/১৬৪

ইলমে দ্বীনের ফযীলত

সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَم، الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم.

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। -সূরা আলাক (৯৬) : ১-৫

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْن.

বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? –সূরা যুমার (৩৯) : ৯

কুরআনে কারিমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰت,

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। -সূরা মুজাদালাহ (৫৮) : ১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين.

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

আরো ইরশাদ করেছেন–

لاَ حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। এক. আল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দুই. যাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন–

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنّة.

যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে। -আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِع.

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল। -জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে–

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلّا لِخَيْرٍ يَتَعَلّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله.

যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

.إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه

যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. সদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১

আরো ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু যর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল তাই এর *আদব-কায়দার* প্রতি লক্ষ রাখাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সেগুলোর কয়েকটি আলোচনা করা হচ্ছে।

নিয়ত বিশুদ্ধ করা

সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয় এই নিয়তের মাধ্যমে। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়ত ঠিক রেখেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ঈমান এনেছে। আর মুনাফিক এই কারণেই মুনাফিক যে, সে তার ঈমানের ক্ষেত্রে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখেনি। খালেস নিয়তের দ্বারা বাহ্যত ছোট আমলও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার নিয়তের গড়মিলের কারণে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধরূপে আমল করা ছাড়াও পার্থিব বহু উদ্দেশ্য সামনে চলে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অন্বেষণকারীর খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

.مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

.لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارَ النَّار

তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন-

لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتَّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيَّتُه.

পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে। -আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

ইলম অর্জনে এ নিয়ত থাকবে যে, ইলম অন্বেষণ করা, এর জন্য মেহনত করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়। ইলমের দ্বারা নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভূত হয়। সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ইলম শিক্ষা করব এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-মেহনত করব।

ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি

কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে। এক. কারো লেখা পাঠ করা। দুই. কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা। এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল (নিয়মনীতি) ও আদব রয়েছে। প্রথম পদ্ধতির সবচে বড় উসূল হচ্ছে সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّم.

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে। -সহীহ বুখারী ১/২৪

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রাহ. বলেন-

وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصّحُف.

ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়। -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩

কুরআনে কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া। ইরশাদ হয়েছে-

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা যদি না জানো তবে আহলে যিক্রের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৩

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রাহ. তাঁর 'আলমুআফাকাত' গ্রন্থে লিখেছেন-

قالوا إِنّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَال.

আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে। -আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইলম শিক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই- এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না- তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন- সেটা লক্ষ করতে হবে। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন-

إِنّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُم.

এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহ ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ। -সহীহ মুসলিম ১/১৪

ইলমের জন্য দরকার মেহনত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

إِنّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُولَدْ عَالِمًا، وَإِنّمَا الْعِلْمُ بِالتّعَلّم.

তোমাদের কেউই আলেম হয়ে জন্ম লাভ করে না। ইলম তো হাসিল হয় শিক্ষা করার মাধ্যমে। -আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এত বিপুল ইলম কীভাবে অর্জিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন-

بِلِسَانٍ سَؤُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُول.

অধিক জিজ্ঞাসাকারী যবান ও সজাগ হৃদয়ের মাধ্যমে। -ফাযাইলুস সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ ২/৯৭০; আলআহাদু ওয়াল মাছানী, ইবনু আবী আছেম ৩/২৯৩

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট-মুজাহাদা শিকার করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন। আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদেরকেও বলতেন, চল আমরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তাঁরা তো এখন অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, এত বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেত না আর তিনি গিয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন।

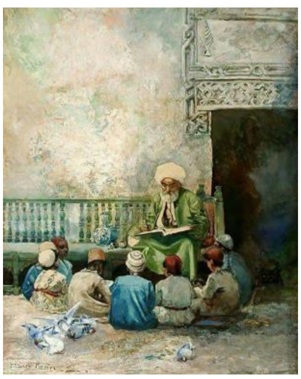
তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। কোনো সময় এমনও হত যে, সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমিও ক্লান্ত। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তাঁর দরজায় শুয়ে পড়তাম। আর বাতাসে ধূলা উড়ে এসে আমার শরীর ধূলা ধূসরিত হয়ে যেত। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন; তখন বলতেন, আয় আল্লাহ! নবীজীর চাচাত ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন্ জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাযির হতাম। তখন আমি বলতাম, কখনোই না। আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।

একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন লোকজন দ্বীনী জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল। তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলত-

كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنَّا.

এই যুবকই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল। -সুনানে দারেমী, হাদীস ৫৯০; তবাকাতু ইবনে সা'দ ২/২৮৪

উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ



ইলমের জন্য জরুরি হল দীর্ঘ সময় উস্তাযের সাহচর্য গ্রহণ করা। আমাদের আকাবিরগণ শুধু এক উস্তাযের কাছেই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতেন। আরবী ভাষার বিশিষ্ট ইমাম আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না রাহ. বলেন, আমি আমার উস্তায প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ইউনুস ইবনে আবী হাবীবের খেদমতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছি। -ওফাইয়াতুল আ'য়ান, ইবনে খল্লিকান ২/৪১৬

ইমাম মালেক রাহ বলেন-

كَانَ الرَّجُلُ يَخْتَلِفُ إِلَى الرَّجُلِ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً يَتَعَلَّمُ مِنْه.

শিষ্য উস্তাযের সাহচর্যে ত্রিশ বছর আসা-যাওয়া করত এবং তার থেকে ইলম অর্জন করত। -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী ৮/১০৮

ইলমের ক্ষেত্রে 'কানাআত' বর্জনীয়

ইলমের ব্যাপারে কোনো প্রকারের 'কানাআত' বা পরিতুষ্টি না থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীনী ইলমের প্রতি থাকতে হবে পরিপূর্ণ লোভ। ইলম অর্জনের কাজ করতে হবে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতার সাথে। ইলম অন্বেষণে অন্তত এতটুকু মনোনিবেশ থাকতে হবে, যতটুকু থাকে দুনিয়ার মোহে ডুবন্ত ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ، وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيَا.

দুই লোভী এমন যে, তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না- ইলম-লোভী, আর দুনিয়ালোভী। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯৭৯৮

সুতরাং ইলমের প্রতি আমার ভালবাসা, লোভ এবং তা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত।

অহংকার বড় ভয়ংকর ব্যাধি। অহংকারের কারণে অন্যান্য অনেক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ইলমের মতো মহা কল্যাণ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। আবার অনেকের ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু লজ্জার কারণে শিখতে পারে না।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রাহ. বলেন-

لاَ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِر.

অনর্থক লজ্জাকারী ও অহংকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। -সহীহ বুখারী ১/৩৮

লজ্জা অনেক প্রশংসনীয় একটি গুণ। তবে অনর্থক লজ্জা ভালো নয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেছেন-

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয় না। -সহীহ বুখারী ১/৩৮

আর অহংকার তো মুমিনের সাথে যায় না। মুমিন হবে বিনয়ী। চলনে বলনে সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী। ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হতে হবে আরো বেশি বিনয়ী। আমার আবার কিসের অহংকার! হযরত মূসা আ.-এর মতো মহান নবী যদি ইলমের জন্য হযরত খাযির আ.-এর পিছে পিছে ঘুরতে পারেন, ইলমের জন্য বহু কষ্ট শিকার ও সবর করতে পারেন; সেই তুলনায় আমি কে। আমার আবার কিসের অহংকার!

ইলমের ধারক-বাহকগণকে সম্মান করা

কারো সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা যদি স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দিয়ে থাকেন তবে তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকির আলামত। আলেম ও তালিবে ইলমের মর্যাদা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। সুতরাং তাদের মর্যাদাকে আর কেউ ছোট করতে পারে না। তাদের মর্যাদাকে যারা ছোট করবে তারা নিজেরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ছোট হয়ে যাবে। সমস্ত গোমরাহ ফেরকা ও বাতিলপন্থীরা উলামা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একজোট। কারণ গোমরাহী ও বাতিলের বিরুদ্ধে আলেমরাই সর্বপ্রথম সোচ্চার হন। এজন্য বাতিল ও গোমরাহী চেনার একটি উপায় এ-ও যে, তারা হবে উলামা-বিদ্বেষী। হাসান বসরী রাহ. বলেন, আবু দারদা রা. ও ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُحِبًا أَوْ مُتَّبِعًا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ. قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَنِ الْخَامِسُ؟ قَالَ: الْمُبْتَدِعُ.

তুমি আলেম হও। নয়তো আলেমের ছাত্র হও। নয়তো আলেমকে মহব্বতকারী হও। নয়তো আলেমের অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না। তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। বর্ণনাকারী হাসান বসরী রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, পঞ্চম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে, বেদআতি। -আলইবানাহ, ইবনে বাত্তাহ, বর্ণনা ২১০; আলমাদখাল, বায়হাকী, বর্ণনা ৩৮১; জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল বার, বর্ণনা ১৪২

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে আহলে ইলমের সাক্ষ্যকে দলিলরূপে পেশ করেছেন-

شَهِدَ اللهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ.

আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও 'উলুল ইলম'ও যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্বজগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮

বিশিষ্ট তাফসীরকারক তাবেঈ সুদ্দী রাহ. বলেন, 'উলুল ইলম' দ্বারা উদ্দেশ্য-

جَمِيع عُلَمَاءِ الْمُؤْمِنِين.

মুমিনদের আলেমগণ।

ইমাম কালবীও এমনটি বলেন। -তাফসীরে বাগাবী ১/৪২০; তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ২/৬১৭

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. সুদ্দী রাহ.-এর মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। -তাফসীরে কুরতুবী ৪/৪১

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلّوا وَأَضَلّوا.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইলমকে মানুষদের থেকে ছিনিয়ে তুলে নেবেন না। তবে তিনি ইলমকে উঠিয়ে নেবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। একপর্যায়ে যখন (দুনিয়াতে) কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে যখন (দ্বীনের কোনো বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হবে; তারা না জেনে উত্তর দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৩

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হল। তাদের একজন ছিল আলেম অপরজন আবেদ। তখন নবীজী ইরশাদ করলেন-

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ.

আবেদের (আলেম নয় এমন ইবাদাতগুযার নেককার ব্যক্তি) উপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদার ন্যায়। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৫

আরো ইরশাদ করেন-

إِنّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنّمَا وَرّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ দিনার-দিরহামের (অর্থ-সম্পদের) ওয়ারিশ বানান না। তাঁরা ওয়ারিশ বানান ইলমের। সুতরাং যেই ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো (মিরাছের) এক বিরাট অংশ গ্রহণ করল। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৪১

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবীজীর দরবারে আসত এবং দ্বীনী ইলম তলব করত। অপরজন ছিল পেশাজীবি। একদিন পেশাজীবি ভাই এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার তালিবে ইলম ভাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল (অর্থাৎ সে দুনিয়ার কাজ-কর্ম করে না)। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাজীবি ভাইকে বললে-

لَعَلّكَ تُرْزَقُ بِهِ.

সম্ভবত তুমি তার (তালিবে ইলমের) কারণেই রিযিক পাচ্ছ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৪৫

হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেম ও তালিবে ইলমের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন-

وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ.

নিশ্চয় ফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে আসমান-যমীনের সবকিছু। এমনকি পানির নিচে থাকা মাছ। (অন্য বর্ণনায়, গর্তের পিপিলিকা।) আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন তারকারাজির মাঝে চন্দ্র যেমন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮২, ২৬৮৫; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/১৬১

দ্র. কেউ কেউ এই হাদীসের-"لتضع أجنحتها" -এই বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন, 'ডানা বিছিয়ে দেয়া।' আবার কেউ বলেছেন এর অর্থ হল, 'তালিবুল ইলমের সম্মানে বিনয়াবনত হওয়া।' কেউ বলেছেন, 'উড্ডয়ন বন্ধ করে থেমে যাওয়া ও যিকিরের জন্য অবতরণ করা।' মূলত এ বাক্যের মাঝে এ সবক'টি অর্থেরই অবকাশ রয়েছে। (মাআলিমুস সুনান ৪/১৮৩; মেরকাতুল মাফাতীহ ১/২৯৬ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায়)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলমের গুরুত্ব বোঝার এবং ইখলাস ও আদবের সাথে দ্বীনী ইলম অর্জনের তাওফীক দিন।

তথ্যসূত্র: https://www.alkawsar.com/bn/article/2707/

দ্বীন শেখার গুরুত্ব ও ফজীলত

আল্লামা মনজূর নূমানী রহঃ

হে আমার দ্বীনি ভাই!

এটা ঠিক যে, সাইয়েদ হওয়ার জন্য সাইয়েদ বংশে জন্ম নেওয়া (এবং বাঙ্গালী হওয়ার জন্য বাংলা ভাষায় কথা বলাই) যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি দাবী করে, আমি অমুক ভাষায় কথা বলি, অমুক বংশে জন্ম আমার, সুতরাং আমি মুসলমান, মুসলমান হওয়ার জন্য আমাকে এর বেশি কিছু করতে হবে না; তবে তার এ-দাবী আপনিও মেনে নেবেন না। কারণ আপনি জানেন, ইসলাম ভাষা ভিত্তিক জাতি কিংবা বংশীয় কোনো জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর নাম নয়, ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের নাম, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে বিশ্ববাসীর কল্যাণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন এবং কোরআন ও হাদীসে যার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। অতএব যে কোনো ভাষার যে কোনো গোত্রের এবং যে কোনো অঞ্চলের যে কেউ দ্বীন শিখবে এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন করবে, সে-ই প্রকৃত মুসলমানরূপে পরিগণিত হবে। আর যে এই দ্বীন শিখবে না, দ্বীনের উপর আমল করবে না, সে প্রকৃত মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে না। বোঝা গেলো, প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্য দুটি বিষয় জরুরি:

এক.

ইসলামী জীবন যাপনের জ্ঞান অর্জন করা, অন্তত এর মৌলিক ও বুনিয়াদি বিষয়গুলো শিখে নেয়া।

দুই.

ব্যবহারিক জীবনে সে বিষয়গুলো মেনে চলা। ইসলাম গ্রহণ করা এবং মুসলমান হওয়ার এটাই প্রকৃত অর্থ।

সুতরাং দ্বীনের জরুরি বিষয়ের ইলম হাসিল করা মুসলমান হওয়ার প্রথম শর্ত। হাদীস শরীফে এসেছে,

(طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (قَالَ الْمزي: هَذَا الحَدِيث روى من طَرق تبلغ رُتْبَة الْحسن. كما في مصباح الزجاجة للسيوطي
ইলম অর্জনের চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

এক্ষেত্রে মনে রাখার বিষয় হলো, সমস্ত ফরজ বিষয় ইবাদতুল্য। সুতরাং দ্বীনের ফরজ বিষয়গুলো শেখা এবং শেখার চেষ্টা করা একটি ইবাদত। আল্লাহ তাআলার দরবারে এর অনেক মূল্য। নবীজী এ বিষয়ে বহু ফজীলত বয়ান করেছেন। এক হাদীসে এসেছে,

.مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِع
যে ব্যক্তি দ্বীন শেখার জন্য ঘর ছেড়ে বের হবে, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকবে। সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং ২৬৪৭

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

.مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّة
যে ব্যক্তি দ্বীন শেখার জন্য কোনো রাস্তায় চলবে আল্লাহ তাআলা এর উসিলায় তার জন্য জান্নাত-মুখী একটি পথ সহজ করে দেবেন। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯৯

আরেক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

(مَنْ طَلَبَ العِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى (هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الإِسْنَاد
যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাআলা তার পিছনের গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন। সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং ২৬৪৮

মোটকথা দ্বীন শেখা, ইসলামের জরুরি বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জন করা নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-মূর্খ, জোয়ান-বৃদ্ধ সকলের উপর সমান ফরজ। আর উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে আমরা জানতে পেরেছি, ইলম শেখার পেছনে মেহনত ও সময় ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহ পাকের দরবারে আমরা বিরাট নেকি ও সওয়াব লাভ করবো ইনশাআল্লাহ। সুতরাং দ্বীনের জরুরি বিষয়গুলোর ইলম হাসিলের সংকল্প করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

বয়স ও ব্যস্ততার কারণে নিয়মিত ছাত্র হয়ে যাদের দ্বীন শেখার সুযোগ নেই, শিক্ষিত হয়ে থাকলে তাদের জন্য সহজ উপায় হলো, কোনো হক্কানী আলিমের পরামর্শ নিয়ে কিতাবপত্র পাঠ করা, আর অক্ষরজ্ঞান না থাকলে অন্যের মাধ্যমে পড়িয়ে শোনার ব্যবস্থা করা। মসজিদে, বাসা-বাড়িতে দ্বীনি কিতাব পড়ার এবং শোনার রেওয়াজ চালু করা। তাহলে সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে ধর্মীয় জ্ঞান ব্যপকতা লাভ করবে।

আসুন, আমরা নিজেরা দ্বীনের কথা শিখি, অপরকে শেখাই। দ্বীনী কথার প্রচার ও প্রসারকে জীবনের লক্ষ্য বানাই। হাদীস শরীফে এসেছে,

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ. وَفِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ ...وَالْفَضَائِلُ
.تُرْوَى عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَالْحُجَّةُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ إِنَّمَا تُتَقَصَّى فِي الْأَحْكَامِ وَفِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ :جامع بيان العلم وفضله

যে ব্যক্তি দ্বীন যিন্দা করার নিয়তে (অর্থাৎ অন্যের মাঝে দ্বীন ছড়ানো এবং অন্যকে আমল করানোর উদ্দেশ্যে) ইলম শিখবে, আর এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, জান্নাতে সে নবীগণের এত নিকটে থাকবে যে, তার ও নবীগণের মাঝে একটি মাত্র স্তরের পার্থক্য থাকবে। -জামিউ বায়ানিল ইলম, ১/২০৭

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীন শিখে অপরকে শেখানোর এবং নিজে দ্বীনের উপর চলে অপরকে চালানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

বড়দের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মাওলানা শাহাদাত সাকিব



মানুষের জীবন পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে মানুষের জীবননদী নতুন বাঁক নেয়। পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে মনের মাঝে। তখন আমরা আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করি | পিছনের জীবনের হিসাব নিই। অসংখ্য মানুষ এমন আছেন, যাদের জীবনের দীর্ঘ একটা সময় জাগতিক জ্ঞান অর্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ইত্যাদিতে কেটে যায়। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার দরুন দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানটুকুও অর্জন করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। পারিবারিক অসচেতনতা, দ্বীন শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া, কিংবা নিজের অবহেলা এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ।

জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার পর নিজের মাঝে নতুন উপলব্ধি জাগে। অতীত জীবনের উপর অনুশোচনা হয়। হয়ত কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবতে কিংবা কোনো দ্বীনী মেহনতের বরকতে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে | তখন দ্বীনী ইলম না শেখার উপর আক্ষেপ হতে থাকে মনের গভীরে। এই উপলব্ধি, আক্ষেপ ও অনুশোচনা একটি ইতিবাচক দিক, যা ব্যক্তিকে নিজের জীবন নতুনভাবে গড়ার এবং আলোকিত পথের পথিক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। ভেতরে প্রেরণা যোগায়। তবে অনেকের ক্ষেত্রে দুঃখজনক একটি বাস্তবতা হল, মনের ভেতর উপলব্ধি ও অনুশোচনা জাগলেও এর উপর ভিত্তি করে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। দ্বীনী জীবন গঠনে যতটুকু উৎসাহ দেখা যায় দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে ততটুকু উৎসাহ দেখা যায় না।

দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সবচেয়ে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِیْۤ اٰدَمَ.

আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭০

অন্যান্য প্রাণিজগত থেকে মানবজাতির রয়েছে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য; যা মানুষকে মহিমান্বিত করে তুলেছে এবং অন্যান্যদের মাঝে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। অন্যান্য প্রাণি শুধু তাদের জীবন ও প্রাণ রক্ষার তাগিদে নিজের সমস্ত চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করে। জীবন ধারণের এ সহজাত বোধ ও প্রবণতাকে কেন্দ্র করে তাদের দিন-রাতের সমস্ত কর্ম আবর্তিত। তাদের জীবন থাকে নির্দিষ্ট স্বভাবের গণ্ডিতে বাঁধা। যার বৃত্ত থেকে কখনো তাদের উত্তরণ ঘটে না। কিন্তু মানুষ এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেবল জীবন ধারণ ও জীবন যাপন করাই মানুষের সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়; বরং ইবাদাত তথা আল্লাহ তাআলার বন্দেগি করার জন্যই মানব জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। -সূরা যারিয়াত (৫১) : ৫৬

তাই আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর হুকুম মেনে চলা মুমিন বান্দার মূল দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলার হুকুম জীবনের সমস্ত অঙ্গন জুড়ে পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন সবকিছুতেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার হুকুম। একজন প্রকৃত মুমিন জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহর হুকুম লংঘন করে না। তাই কোন্ ক্ষেত্রে আল্লাহর কী আদেশ ও কী নিষেধ তা জানা একজন মুমিনের অবশ্যকর্তব্য। বুঝা গেল, দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা এমন কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, যা না শিখলেও হয়। বরং আমাদের সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই এ শিক্ষা আমাদের অর্জন করতে হবে।

দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের ফযীলত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰت,

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন বহুগুণ। -সূরা মুজাদালা (৫৮) : ১১

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه.

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّة.

যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১

অধিকাংশ সাহাবী দ্বীনী ইলম অর্জন করেছেন বয়স্ক অবস্থায়



বয়স বেশি হওয়া এমনকি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়াও দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা নয়। সাহাবায়ে কেরাম হলেন সর্বপ্রথম ইলমে ওহী শিক্ষা গ্রহণকারী। নবুওতের পাঠশালার সর্বপ্রথম ছাত্র। তাঁদের বক্তব্য ও শিক্ষার আলোকেই আমাদের কুরআন-সুন্নাহ্ বুঝতে হয়। অথচ তাঁদের অধিকাংশই বয়স অনেক হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং দ্বীন শিখেছেন। নবীজীর পর এ উম্মতের সবচে বড় জ্ঞানী হলেন আবু বকর রা.| অথচ তিনি যখন নবীজীর সংস্পর্শধন্য হয়ে ইলম শেখা শুরু করেছেন তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৪০ বছর। এমনিভাবে ওমর রা., আবু যর রা., আবুদ দারদা রা., প্রমুখ উম্মতের সবচে জ্ঞানী এ মহামানবগণ ইলম শিখেছেন বয়স অনেক হয়ে যাবার পর। ইমাম বুখারী রাহ. হযরত ওমর রা.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন-

باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر : "تفقهوا قبل أن تسوَّدوا "..

তোমরা বয়স অধিক হওয়ার আগেই ইলম শিখে নাও।

সহীহ বুখারীতে ওমর রা.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করে ইমাম বুখারী রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন–

قال أبو عبد الله -يعني البخاري نفسه- : وبعد أن تسوّدوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنِّهم.

অর্থ্যাৎ বয়স বেশি হওয়ার পরও ইলম শিক্ষা কর। কারণ সাহাবায়ে কেরাম (অধিকাংশ) তো বয়স অধিক হওয়ার পরই দ্বীনী ইলম শিক্ষা করেছেন। -সহীহ বুখারী, পৃ. ৩৯

খোদ ওমর রা.-এর অবস্থাই দেখুন, বয়স হবার পরও কীভাবে তিনি দ্বীনী ইলম শিখেছেন। তিনি বলেন, আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী পালাক্রমে নবীজীর কাছে যেতাম। সে একদিন থাকত। আমি একদিন থাকতাম। যেদিন আমি থাকতাম সেদিনকার ওহী ও অন্যান্য বিষয় আমি তাকে জানাতাম। আর যেদিন সে থাকত সেও অনুরূপ করত। (দ্র. সহীহ বুখারী, বর্ণনা ৮৯)

বড়দের দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম হতে পারেন আমাদের প্রেরণার উৎস।

বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করা জাগতিক শিক্ষা অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ভালো একটা চাকরি পাওয়া, একটু সুখী জীবন লাভ করার জন্যই সাধারণত এ শিক্ষা অর্জন করা হয়। কিন্তু দ্বীনী শিক্ষা এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু পার্থিব জীবনই নয় পরকালীন জীবনের কল্যাণ লাভ করা এ ইলম অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর হুকুম আহকাম জেনে সে অনুযায়ী জীবনযাপন, নবীজীর সুন্নতের অনুসরণ, ফেরেশতাদের দুআ-ইসতিগফার লাভ ইত্যাদি সবকিছুই ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার ফযীলত। আর যে কোনো মানুষই বোঝে, এ ফযীলত অর্জনের নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। যে কোনো মানুষই ইলম শিক্ষা করার মাধ্যমে এ ফযীলতগুলো অর্জন করতে পারে।

قيل لأبي عمرو بن العلاء: هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم.

আবু আমর ইবনুল আলা'কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বৃদ্ধ বয়সে ইলম শিক্ষা করা কি উত্তম কাজ? তিনি উত্তরে বলেন, বেঁচে থাকাটা যদি তার জন্য উত্তম হয় তবে ইলম অর্জন করা কেন উত্তম হবে না! -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী, খ. ২, পৃ. ১৬৭

কোনো একজন আলেমকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কতদিন পর্যন্ত মানুষকে শিখতে হবে? তিনি উত্তরে বলেন, মৃত্যু পর্যন্ত।

আমাদের ইতিহাস আলো করে আছে এমন অসংখ্য মহামানবদের ঘটনা, মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যারা ইলম চর্চা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তেও ইলমের মুযাকারা করেছেন। এরকম অসংখ্য নযীর আছে আমাদের ইতিহাসে।

পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার কিছু ইতিবাচক দিক

কিছু বয়স হওয়ার পর দ্বীন শেখার ইতিবাচক দিক রয়েছে, যা ইলম অর্জনের জন্য অনেক সহায়ক। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই শিশু-কিশোর অভিভাবকদের চাপে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দ্বীনী ইলম অর্জন করে। ভেতরের প্রেরণা, নিজের ইচ্ছা, ফযীলত অর্জন করার মানসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে অনুপস্থিত। তবে একজন বয়স্ক ব্যক্তির দ্বীন শিক্ষা করার অবস্থা হয় এর থেকে ভিন্ন। বয়স্ক ব্যক্তির মনে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের প্রেরণা সৃষ্টি হয় মনের ভেতর থেকে। সেখানে অন্যের পক্ষ থেকে চাপ কিংবা বাধ্যবাধকতারও কোনো ব্যাপার থাকে না; বরং সাধারণত ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে ইলম অর্জনের ফযীলত হাসিল করার জন্য এবং সহীহভাবে দ্বীনের উপর চলার জন্য দ্বীনী ইলম অর্জনে সচেষ্ট হয়। হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়েই ইলম অর্জনে নিমগ্ন হয়। তাই বয়স্ক ব্যক্তির অদম্য আগ্রহ, তীব্র বাসনা তাকে অনেক দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায় লক্ষ্যপানে।

তাছাড়া একজন বয়স্ক ব্যক্তির বুঝ ও অনুধাবন শক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। যে কোনো বিষয় অল্প সময়ে বোঝা ও অনুধাবন করা তার জন্য সহজ। ফলে দ্বীনের অনেক কিছুর বুঝ অল্প সময়েই তার অর্জন হয়, যা শেখাকে সহজ ও ত্বরান্বিত করে। সাথে সাথে বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ইলম অনুযায়ী আমল করার সাওয়াবও অর্জিত হয়।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে আগ্রহ ও পূর্ণ মনোযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগ্রহ ও মনোযোগ পূর্ণমাত্রায় থাকলে দীর্ঘ সময়ের পড়া অল্প সময়েই আয়ত্ত হয়ে যায়। পরিণত বয়সের একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের সময় এ আগ্রহ ও মনোযোগ সাধারণত পূর্ণ মাত্রায় থাকে, যা অল্প সময়ে তাকে অনেক এগিয়ে দেয়।

সালাফের জীবন থেকে কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত



ইসলামের ইতিহাস আলো করে আছে এমন অসংখ্য মনীষী রয়েছেন, যাদের বয়স অনেক হয়ে যাওয়ার পর তাদের হৃদয়ে ইলম অর্জনের আগ্রহ জেগেছিল। এরপর নিরন্তর মেহনত ও অব্যাহত মুজাহাদার মাধ্যমে তারা ইলম অর্জন করেন এবং নিজেদের ও অন্যদের ইলমের আলোয় আলোকিত করেন। এমন কয়েকজন মনীষীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হল।

আলী ইবনে হামযা

ইমাম কিসাঈ নামেই যিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইলমে নাহুর প্রতিটি ছাত্র এই নামের মহান মানুষটির সাথে পরিচিত। আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রে যার রয়েছে বিশাল অবদান। ইলমে কিরাআতেরও অন্যতম ইমাম তিনি। যে সাত কেরাতের কথা আমরা সবাই জানি, সে সাত কেরাতের এক কেরাত তাঁর দিকেই সম্পৃক্ত। তিনি বয়স অনেক হওয়ার পরই ইলমে নাহু শেখা শুরু করেছেন। আল্লামা কিফতী রাহ. বলেন-

انما تعلم الكسائي النحو بعد الكبر فلم يمنعه ذلك من ان برع فيه .

কিসাঈ বয়স অনেক হওয়ার পরই নাহু শেখা শুরু করেন। এ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনে অধিক বয়স তার জন্য বাধা হয়নি। -আমবাউর রুয়াত ২ / ২৭১

আবুর রহমান ইবনুল কাসেম

মালেকী মাযহাবের অন্যতম ইমাম। ইমাম মালেক রাহ.-এর সবচে কাছের ছাত্রদের অন্যতম। মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব আলমুদাওওয়ানাতুল কুবরার রচয়িতাও তিনি। মালেকী মাযহাবে মাশহুর রেওয়ায়েত বলতে উপরোক্ত গ্রন্থে ইবনুল কাসেম বর্ণিত ইমাম মালেক রাহ.-এর বক্তব্যকেই বুঝানো হয়। এ মহান মনীষীও ইলম শেখা শুরু করেছেন বয়স অনেক হওয়ার পর। কাযী ইয়ায রাহ. লিখেন-

قال ابن وضاح سمع ابن القاسم من المصريين والشاميين، وإنما طلب وهو كبير.

ইবনে ওয়ায্যাহ বলেছেন, ইবনুল কাসেম মিসর ও শামের উলামায়ে কেরাম থেকে ইলম অর্জন করেছেন। আর তিনি অনেক বয়স হওয়ার পর ইলম অণে¦ষণ শুরু করেন। -তারতিবুল মাদারিক ৩/২৪৮

আল্লামা ইবনে হাযম রাহ.

ইসলামের ইতিহাসে যারা অমর হয়ে আছেন তিনি তাদের অন্যতম। আল্লামা যাহাবী রাহ. তার ব্যাপারে বলেন-

ومن أشهر من ذكر عنهم الطلب بعد كبر السن ابن حزم الأندلسي.

বয়স হওয়ার পর যারা ইলম শেখা শুরু করেছেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ইবনে হাযম আন্দালুসী।

তার ইলমে ফিকহ অন্বেষণের সূচনা হয়েছিল বিশেষ একটি ঘটনার প্রেক্ষাপটে। ইবনে হাযম রাহ. নিজেই সে ঘটনা বলেছেন। একদিন তিনি এক জানাযায় শরিক হন। তখন এক মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়েন। এক ব্যক্তি তখন তাকে বলল, ওঠ, আগে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়। তখন তার বয়স ছিল ছাব্বিশ। তিনি তখন নামাযে দাঁড়িয়ে যান। জানাযা শেষে ফিরে আসার সময়ও মসজিদে যান। এবার প্রবেশ করা মাত্রই নামায শুরু করে দেন। তখন তাকে বলা হল, আরে বস বস; এখন নফল নামায পড়ার সময় নয়। তখন ছিল আসরের পর। এ ঘটনাটি তার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। এরপর থেকেই তিনি ইলম অর্জন শুরু করেন।

(মু'জামুল উদাবা, ইবনে হাযম রাহ.-এর জীবনী)

ইয্যুদ্দীন ইবন আব্দুল সালাম রাহ.

ইলমী আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। সত্য কথন ও সাহসী উচ্চারণে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ যাকে সুলতানুল উলামা (উলামা-সম্রাট) উপাধি দিয়েছেন। বাস্তবিক অর্থেই তিনি ছিলেন সম্রাটতুল্য একজন মানুষ। মানুষের হৃদয়জগতে তিনি ছিলেন সম্রাটের চেয়েও সম্মানিত। পরাক্রমশালী শাসকেরা পর্যন্ত মাথা নত করত তার সামনে। ইয্যুদ্দীন রাহ.-এর জানাযার খাট নিয়ে মানুষ যখন শাহী প্রাসাদের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল তৎকালীন শাসক আলমালিকুয যাহির তখন বলেছিল-

আজ আমার রাজত্ব স্থিতিশীলতা লাভ করেছে। এই শায়েখ যদি জনগণকে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলতেন তাহলে তিনি আমার থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে পারতেন। -তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ৮/২১৫

এই উলামা-সম্রাটও ইলম শেখা শুরু করেছেন বয়স অনেক হওয়ার পরে। তার জীবনীতে লেখা হয়েছে-

كان الشيخ عز الدين في أول أمره فقيرا جدا ولم يشتغل إلا على كبر.

ইয্যুদ্দীন রাহ. প্রাথমিক অবস্থায় খুবই গরীব ছিলেন। তিনি ইলম অর্জনে মাশগুল হয়েছেন অনেক বয়সে। -তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ৮/২১৫

এগুলো তো গেল সালাফের যুগের ঘটনা। আমাদের এ যুগেও বয়স হওয়ার পর দ্বীনী ইলম অর্জনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

অতীত ও বর্তমানে বয়স্ক দ্বীনী শিক্ষার এত অসংখ্য নযীর রয়েছে যে তা নিয়ে আলাদা গ্রন্থ তৈরি হতে পারে। এসকল মানুষেরা আমাদের জন্য হতে পারেন প্রেরণার উৎস।

পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা



বয়সকালে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে একটি চিন্তা অনেকের মনেই উঁকি দেয়। তা হল, বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে কিছু আর মনে থাকতে চায় না। কোনো কিছু মুখস্থ করতে হলে অনেক সময় লাগে। এ চিন্তার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। তবে এ বাস্তবতা মেনে নিয়েই বলছি, মানুষ যখন কোনো কাজের হিম্মত করে তার জন্য শতভাগ চেষ্টা ব্যয় করে তখন সে কাজটি আল্লাহ তাআলা তার জন্য সহজ করে দেন। একটা উদাহারণ দেই। ইমাম কাফফাল শাশী। ফিকহে শাফেয়ীর অবিসংবাদিত ইমাম। আল্লামা সামআনী রাহ. তার ব্যাপারে লিখেছেন-

كان وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا، وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره، وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه أمتن طريقة، وأكثرها تحقيقا، رحل إليه الفقهاء من البلاد، وتخرج به أئمة، ابتدأ بطلب العلم وقد صار ابن ثلاثين سنة، فترك صنعته، وأقبل على العلم.

তিনি ছিলেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মুখস্থশক্তি এবং তাকওয়া-পরহেযগারিতে যুগের অনন্য ব্যক্তি। ফিকহে শাফেয়ীর মধ্যে তার যে প্রভাব ও অবদান রয়েছে তা তার যুগের অন্য কারো ছিল না। বিভিন্ন দেশ থেকে ফকীহগণ ইলম অর্জনের জন্য তার উদ্দেশে সফর করতেন। তার হাতে অনেক ইমাম গড়ে উঠেছেন। এ মহান মনীষীও ইলম শেখা শুরু করেছেন ৩০ বছর বয়সে। ইলম শেখা শুরু করার পর তিনি তার পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইলম অর্জনে নিমগ্ন হন। -সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৩/১৩০

আল্লামা সুবকী রাহ, তার ব্যাপারে লেখেন-

الإمام الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا... كان قد ابتدأ التعلم على كبر السن بعدما أفنى شبيبته في صناعة الأقفال.

তিনি হলেন পৃথিবীবিখ্যাত ইমামদের অন্যতম। তালা বানানোর পেশায় যৌবন কাটিয়ে শেষ বয়সে তিনি ইলম অর্জনে নিমগ্ন হয়েছেন। (তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা, ৫/৫৪)

আল্লামা সুবকী রাহ. যাকে পৃথিবী বিখ্যাত ইমাম বলেছেন তিনি যে আসলেই কত বড় ইমাম ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। এ মহান মনীষীর জীবনেও উপরে উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতাটি এসেছিল এবং হয়ত তার মাত্রা আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি ছিল। তবুও সে প্রতিবন্ধকতা দূর করে তিনি পৌছে গেছেন আকাশের সীমানায়।

ইলম শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথমে 'র্মাও' এলাকার একজন শায়েখের কাছে যান। তিনি তাকে কিতাবুল মুয়ানীর এ তিনটি শব্দ প্রথম দিন শেখান-

هذا كتاب اختصرته.

এ পাঠ গ্রহণ করে তিনি ছাদে চলে যান। এশা থেকে ফজর পর্যন্ত এ তিনটি শব্দই মুখস্থ করতে থাকেন। সারা রাত জেগে থাকার কারণে শেষ রাতে একটু চোখ লেগে আসে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সারা রাত ধরে কী পড়েছেন কিছুই মনে পড়ছে না। তিনি এ কথা ভেবে লজ্জিত হচ্ছিলেন যে, শায়েখকে আমি কী বলব। এ দুশ্চিন্তার মাঝেই হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। এমন সময় প্রতিবেশী এক মহিলা বলল-

আবু বকর! গতকাল রাতে هذا كتاب اختصرته বলে বলে তো সারা রাত আমাদের ঘুমাতে দাওনি।

মহিলার অভিযোগভরা কথার মাঝেই তিনি যেন খুঁজে পেলেন হারানো সম্পদ। শায়েখের কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। শায়েখ তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এ কারণে যেন তোমার ইলম শেখার আগ্রহে ভাটা না পড়ে। কারণ তুমি যখন ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকবে এবং সবসময় মুখস্থ করতে থাকবে তখন তা তোমার অভ্যাসে পরিণত হবে।

শায়েখের কথা সত্যি হয়েছিল। কঠিন অধ্যাবসায় ও চেষ্টা-মুজাহাদার মাধ্যমে এমন দুর্বল মুখস্থশক্তির অধিকারী মানুষটিই হয়েছিলেন-

الإمام الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا.

পৃথিবীবিখ্যাত ইমামদের অন্যতম প্রধান। ইলমের সাগর।

আমাদের মধ্যে এমন লোক ক'জন আছে, যে সারা রাত পড়ে মাত্র তিনটি শব্দও মুখস্থ করতে পারে না। তাই বড়দের দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখস্থ না হওয়া কিংবা বুঝে না আসা- এ সমস্যার সমাধান একটাই- চেষ্টা, চেষ্টা এবং চেষ্টা।

একটা বাস্তবতা হলো, দুনিয়াবী বিভিন্ন চিন্তা ও ব্যস্ততায় জড়িয়ে থাকলে মানুষের মুখস্ত-শক্তি কমে যায়। ইলমের জন্য ফারাগাত (ব্যস্ততামুক্ত) ও ইনহিমাক (গভীর নিমগ্নতা) থাকা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কেউ যখন পার্থিব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ নিমগ্নতার সাথে ইলম অর্জন করে আল্লাহ তাআলা তখন তার মেধা খুলে দেন। বয়স্করাও এর থেকে ব্যতিক্রম নন।

আসলে যদি দিলে সাচ্চা ইরাদা ও পোখতা হিম্মত থাকে তাহলে সব কঠিনকেই আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেন। আর যদি শত চেষ্টার পরও মুখস্থ না হয় বা না বুঝে আসে তবুও এ চেষ্টার কারণে আল্লাহ তাআলা আজর ও সাওয়াব আমাদের দান করবেন।

বড়দের দ্বীন শিক্ষার দ্বারা এটা বুঝানো হচ্ছে না যে, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এখনই মাদরাসায় ভর্তি হয়ে যেতে হবে; বরং প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝে কিছু সময় ফারেগ করে আমরা ইলম অর্জন করতে পারি। আমার পরিচিত একজনকে দেখেছি, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়েও প্রতিদিন একটু একটু কুরআন মুখস্থ করতে করতে তিনি হাফেয হয়েছেন। আমরাও চাইলে কুরআন মুখস্থ করতে পারি; হাফেয হওয়া সম্ভব না হলে অন্তত কিছু অংশ তো হিফয করতে পারি।

কুরআন বিশুদ্ধভাবে পড়তে শেখা ও প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলো জানা- এটা তো একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের সবার দায়িত্ব। এর পাশাপাশি আরো কিছু দ্বীনী বিষয়ের জ্ঞানও উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে শেখা যেতে পারে।

বয়স্কদের দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে থানভী রাহ. বলেছেন, বর্তমানে লোকদের এত হিম্মত এবং সময়-সুযোগও নেই যে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে আলেম হবে। এজন্য দ্বীন শেখা ও শেখানোর এমন একটা সহজ পদ্ধতি বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ইলম অর্জনের ফরয দায়িত্ব আদায় করে উভয় জাহানের সফলতা অর্জন করতে পারে। ইলম অর্জনের জন্য পাঁচটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে :

১. দ্বীনী বই-পুস্তক পড়া কিংবা অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শোনা।

২. পরিবারের লোকজনদেরকে নিজে পড়ানো কিংবা অন্যকে দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করা।

৩. উলামায়ে কেরাম থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করা।

৪. ওয়াজ শোনা।

৫. বিশেষজ্ঞ আলেমদের সোহবতে থাকা।

দ্বীনী বই-পুস্তক পড়ার পদ্ধতি হল, যারা পড়তে পারে তারা ভালো কোনো আলেমের কাছে গিয়ে প্রতিদিন সবক হিসাবে কিছু কিছু পড়বে। যদি এমন কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে নিজে নিজেই পড়তে থাকবে। কোথাও বুঝে না আসলে কিংবা অস্পষ্টতা থাকলে পেন্সিল দিয়ে তা দাগ দিয়ে রাখবে। পরবর্তীতে ভালো কোনো আলেমের কাছ থেকে জেনে নেবে। এভাবে যতটুকু ইলম অর্জন হতে থাকবে তা অন্যদেরকেও শেখাবে এবং নিজ ঘরের স্ত্রী-সন্তানদের কেও তালীম দেবে।

যারা পড়তে পারে না তারা পড়াশোনা জানে এমন কারো মাধ্যমে সেসকল কিতাব পড়িয়ে শুনবেন। এর জন্য কোনো খরচের প্রয়োজন হলে সবাই মিলে একটু একটু জমা করে তার ওযিফার ব্যবস্থা করবেন। দুনিয়ার প্রয়োজনে আমরা কত টাকা খরচ করি। দ্বীনের জন্য সামান্য ক'টাকা খরচ করা এমন কোনো কঠিন বিষয় নয়। তবে পড়ার ক্ষেত্রে নিজে নিজে কিতাব নির্বাচন করবে না; বরং আল্লাহওয়ালা ও যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো আলেমের সাথে পরামর্শ করে কিতাব নির্বাচন করতে হবে।

তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ মাসআলা জিজ্ঞাসা করার পদ্ধতি হল, দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে যখন কোনো কাজ করার প্রয়োজন পড়বে এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের মাসআলা জানা না থাকবে তখন সে ব্যাপারে অবশ্যই কোনো আল্লাহওয়ালা আলেম থেকে জিজ্ঞেস করে নিবে। তিনি যা বলে দেবেন তা ভালোভাবে মনে রাখবে এবং অন্যদেরকেও সে বিষয়টি জানাবে। যদি এমন আলেমের কাছে যাওয়ার সুযোগ না হয় তবে তার কাছে চিঠি লিখে সে সম্পর্কে জেনে নেবে।

দ্বীন শেখার এ পদ্ধতি কত সহজ। এ পদ্ধতিতে যদি কেউ দ্বীন শেখা অব্যাহত রাখে তাহলে তেমন কষ্ট ছাড়াই শেখা সম্ভব। -তুহফাতুল উলামা, ৪৩।

আল্লাহ তাআলা আমাদের মনে দ্বীন শেখার আগ্রহ দান করুন এবং সকলকে তাওফিক দান করুন- আমীন।

তথ্যসূত্র:https://www.alkawsar.com/bn/article/2652/

নারীর ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

লেখকঃ মাওলানা শুআইব মাহদী



মহান রাব্বুল আলামীন দ্বীন শিক্ষাকে প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ করে দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টির সেরা , শরীয়তের ভাষায় আশরাফুল মাখলুকাত যার উপাধি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুকের খেতাবে ভূষিত এ মানব সম্প্রদায়। যাদের উপর মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্দেগী আবশ্যক করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

অর্থঃ আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত ৫৬)এই বন্দেগী পালনে মহান রবের পক্ষ থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আদিষ্ট। আর আমরা জানি, ইবাদাত পূর্ণভাবে আদায়ের জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষা অপরিহার্য। (যেটুকু না শিখলে ফরজ ইবাদাত পালন করা সম্ভব নয়।) যেহেতু ইবাদাতের ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ে আদিষ্ট, সেহেতু বিদ্যার্জনের জন্য এ দুয়ের রয়েছে সমান অশগ্রহণের শরীয়ত সম্মত সুযোগ।

প্রিয় পাঠক। আজ আমরা ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও নারীর দ্বীনি জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের চেষ্টা করবো। ইনশাআল্লাহ।

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব:

ইসলাম নারী শিক্ষার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে,এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহের বহু স্থানে উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাইরশাদ করছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاس...

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং আপন পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও (সূরা-তাহরীম-৬) উক্ত আয়াতে কারীমায় মহান রাব্বুল আলামীন পরিবারবর্গকে (মা-বোন ও সন্তান) কেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর কথা বলেছেন। আর বন্দেগীর জন্য ইলমে দ্বীনের শিক্ষা অপরিহার্য। স্পষ্টতই নারীর দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম | কুরআনও যার ব্যাপারে অভিভাবকদের আদেশ করেছে।

অনুরূপভাবে হাদিসের বহু স্থানে নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-

عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة-

অর্থ: শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবীজী সা. আমার কাছে আসলেন, আর আমি তখন হাফসা রা. এর নিকটে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে যেভাবে লিপিবিদ্যা শিখিয়েছো সেভাবে খুঁজলি-পাচড়ার চিকিৎসার পদ্ধতিও কেন শিখিয়ে দিচ্ছো না? (আবু দাউদ-৩৮৮৭) উক্ত হাদিসে হযরত শিফাকে লক্ষ্য করে নবীজীর উক্তি "কেন শিখাচ্ছো না " থেকেই তাঁর গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে। যিনি আল্লাহর রাসূল, তার সাধারণ কথাটা ভিন্নভাবে ব্যক্ত করা নারী শিক্ষার সর্বোচ্চ গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে। এ থেকে মহিলাদের লিপিবিদ্যায় দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব বুঝা যায়। ইমাম শামছুল হক আযীমাবাদী রহ. নারীর লিপিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে – عقود الجمان في جواز الكتابة للنسوان নামক বিরাট একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা মাসআলাটির প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে। শুধু নববী তারগীব নয় বরং মহিলা সাহাবিয়াদের ইলম অর্জনের যে অফুরন্ত জযবা ছিল তাও পরিষ্কার হয় নিচের বর্ণনাটির মাধ্যমে; আবু

হুরায়রা থেকে বর্ণিত, সাহাবিয়াগণ দরবারে নববীতে পয়গাম পাঠালেন যে, আপনি পুরুষদেরকে দ্বীন শিখাচ্ছেন, আমরা নারীরাও ইলম অর্জনে আগ্রহী। তাঁদের শিখার আগ্রহ দেখে নবীজী (সা:) বাঁধা দেয়া তো দূরে থাক, সানন্দে রাজী হয়ে ওদের বাহবা দিয়ে বললেন, "তোমাদের পাঠদান হবে অমুক মহিলার ঘরে"। আর তিনি সেখানে মহিলা সাহবীদেরকে দ্বীনি ও জরুরী মহিলা বিষয়ক হুকুম-আহকাম শিখিয়েছেন।অপর এক হাদিসে প্রিয়নবী সা. ইরশাদ করেন - ثلاثة لهم اجران.... ورجل كانت عنده أمة فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقهافتزوجها فله اجران

অর্থ : তিনি ব্যক্তির জন্য দিগুন সওয়াব রয়েছে। তন্মধ্যে একজন এমন ব্যক্তি যার নিকট একজন দাসী আছে। (যার সাথে সে মিলিত হয়।) সে তাকে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিখিয়েছে, ভালোভাবে দ্বীনি তা'লীম দিয়েছে। এবার তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে নিয়েছে। তার জন্য দু'টি প্রতিদান রয়েছে।জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, ইমাম বুখারী রহ, তার প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনাম চয়নে যথেষ্ট বুৎপত্তি ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। অনেক মুহাদ্দিসের মতে ইমাম বুখারীর ফিকহ্ তাঁর অধ্যায়ের শিরোনামে লুকায়িত রয়েছে। এ হাদিস তিনি যে অধ্যায়ে এনেছেন তার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে – باب تعلم الرجل امته واهله অর্থ: এ অধ্যায়ে ঐ ব্যক্তির বর্ণনা হবে যে তার স্ত্রী–পরিজন ও বাঁদীকে ইলম শিখায়। আমরা হাদিসের অনুবাদে শুধু বাদীর উল্লেখ দেখেছি, তাহলে পরিবারের উল্লেখ করে বুখারী রহ কিভাবে তাঁর ফিকহ প্রকাশ করলেন? এর উত্তরে আমি বুখারী শরীফের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীর উদ্ধৃতি পেশ করছি। ان مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس ان الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله اكد من الاعتناء بالاماء অর্থ : ইবনে হাজার রহ. বলেন, বুখারীর শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এদিক থেকে যে, বাদীর উল্লেখ হাদিসে এসেছে এবং এর উপর ভিত্তি করে স্বাধীনা নারীর আল্লাহর বিধান ও রাসূলের সুন্নাতের শিক্ষা অর্জন বাঁদী অপেক্ষা অতি জরুরী। অর্থাৎ নবীজীর বাঁদীর ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান নিঃসন্দেহে তার উপরস্থ বাকী সব নারী উম্মতকে এতে শামিল করে নেয় এবং এজন্য ইমাম বুখারী রহ. অধ্যায়ের শিরোনামে সমস্ত নারী জাতির উল্লেখ করে দেন। প্রিয় পাঠক! এই হাদিসের যে ব্যাখ্যা ফাতহুল বারী গ্রন্থে লিখিত তা থেকে আমাদের দু'টো শিরোনামের জন্য খোরাক রয়েছে।

প্রথমত: হাদিস থেকে নারী শিক্ষার গুরুত্ব এভাবে বুঝে আসে যে, নবীজী সা. বাদীকে শিক্ষা দিয়ে তাকে আযাদ করে স্ত্রী বানিয়ে নেয়াতে দু'টো প্রতিদানের ঘোষণা দেন। ১. তাকে শিক্ষা দেয়াতে ২. তাকে আযাদ করে স্ব-স্ত্রীত্বে বরণ করাতে। বাঁদীকে আযাদ ও তাকে স্ত্রী বানানো অনেক বড় ধৈর্য্য ও সামাজিক পরিষ্কার ব্যাপার ছিল তৎকালীন সময়ে। অথচ এ শক্ত কাজের বিনিময়ে একটি প্রতিদান এবং শুধু নারীর শিক্ষার বিনিময়ে সম্পূর্ণ এক বিনিময় প্রদানের ঘোষণা করা নারীর শিক্ষার গুরুত্বারোপ বৈ কিছুই না। প্রশ্ন আসে যে, পবিত্র কোরআনে ولهن مثل اللذي عليهن بالمعروف অর্থ : আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন তাদের প্রতি পুরুষের রয়েছে।

এবং প্রসিদ্ধ হাদিস - النساء شقاءق الرجال অর্থ : নারীরা পুরুষের অনুরূপ। (তিরমিযী, হাদিস: ১১৩, ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৬১২) ইত্যাদির থেকে নারী–পুরুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান অধিকারের কথা স্পষ্ট বুঝে আসা সত্বেও হাদিসে বিশেষভাবে নারী শিক্ষার উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা কেন পড়লো? যদি এই হাদিস সমূহ না বলা হতো তবুও তো নারীর ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় শিক্ষিতা হওয়ায় ধর্মীয় বাধা ছিল না। হ্যাঁ সহশিক্ষা, শরীয়ত বিরোধী পরিবেশ, নারীর সুরক্ষার শতভাগ সুবিধা না থাকায় এবং বিশেষত জাগতিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রী বৈষম্যতার দরুণ বর্তমান ফিৎনার যুগে ইসলামী শরীয়ত সম্মত পন্থায় নারী শিক্ষায় বৈধতা দেয় এটা ভিন্ন কথা। এসব সমস্যা না থাকলে নারীর শিক্ষার উপর ধর্মীয় কোন বাধা–নিষেধ নেই। তবুও নবীজী সা.

বিশেষভাবে তাকীদ করা এজন্য যে, তিনি হাদিস পাকে ইরশাদ করেন- اوتيت علم الاولين والاخرين অর্থ: " আমাকে পূর্বাপর সকলের জ্ঞান দেয়া হয়েছে।"

এর আলোকে স্বীয় ঐশী দূরদর্শিতার বলে তিনি বুঝেছিলেন, সুদূর ভবিষ্যতে নারী শিক্ষার গুরুত্ব লোপ পাবে আর এ মহান অধিকার থেকে হয়তোবা তারা বঞ্চিত হবে, তাই তিনি তাদের কথা স্পষ্টত: উল্লেখ করে দিয়েছেন। নারী হলো শিশুর প্রথম বিদ্যালয় | বাচ্চা শৈশবের পুরো সময়টাই মায়ের সাথে কাটায়। এসময় মায়ের থেকে দেখে সে যা শিখে তা তার কচিমনে পাথরের উপর খোদাই করা লিপির ন্যায় বদ্ধমূল হয়ে যায়। প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার সূচনা তাই হয়, যা সে তার মায়ের কাছে থেকে শিখে। অতএব মা যদি নিজে শিক্ষিতা না হয়, ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করার জন্য ভালো-মন্দের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকে, তখন উপযোগী ও কাঙ্খিত তারবিয়াত না পাওয়ায় যে শূণ্যতা বাচ্চার জীবনে সৃষ্টি হয় তা অদূরণীয়। স্কুলে যেসব মিশ্র নৈতিকতার শিক্ষা সে মনে ধারণ করে তা তার অন্তরে বদ্ধমূল হতে যথেষ্ট সময় নেয়। অনেক বিষয়ের মধ্যে একটি ইসলাম শিক্ষা যা নৈতিকাতার পরিচায়ক, এটা তখন সে দীক্ষা হিসেবে নয়, পরিক্ষায় পাশের জন্য পড়া-শুনা করে। যে শিক্ষা ছোটকালে তার নিকট মুখ্য থাকার কথা, তা পরিক্ষার বিষয় হিসেবে আয়ত্ব করে সে, কাজেই মায়ের শিক্ষিত হওয়াটা অত্যন্ত জরুরী, যেন সন্তানের সুষ্ঠভাবে বেড়ে উঠতে তার অবদান প্রকাশিত হয় এবং সন্তান সুনাগরিক হয়ে দেশ-সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। এখন প্রশ্ন হলো, শিশুর নৈতিকতার পূর্ণ বিকাশে মায়ের জাগতিক বিদ্যার প্রয়োজন হবে নাকি দ্বীন শরীয়তের শিক্ষা যা মানুষের জীবন সুগঠনের কথা বলে, শিখায় ও প্রচার করে। এখান থেকে আমাদের দ্বিতীয় আলোচনা:

নারীর ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা:

এ ব্যাপারে কুরআন-হাদিস আমাদের কি বলে? উত্তরে পূর্বোল্লিখিত হাদীস - اجران (ثلاثة لهم.....) যাতে নারীর শিক্ষার তাকীদ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা তালাশ করা যাক | ফতহুলবারী গ্রন্থে যার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বুখারী শরীফের যে ঋণ উম্মতের উপর ছিল তা তার এই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা গ্রন্থ দ্বারা পুরো হয়ে গিয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে– আল্লাহর ফরজ বিধান ও রাসূলের সুন্নাত বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন| আর হাদিসে উল্লেখিত নারীশিক্ষা দ্বারা আমাদের সালফে সালেহীন (সাহাবা, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তী দ্বীনি মুরব্বিগণ) দ্বীনী শিক্ষাই বুঝেছেন| আমি একথা বলছি না যে, নারী সমস্তেরই মহিলা মাদরাসায় পড়া উচিৎ বরং দ্বীনি শিক্ষার দু'টি স্তর রয়েছে। মৌলিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন এবং পরিপূর্ণভাবে দ্বীনি ইলমের বুৎপত্তি অর্জন| প্রথমস্তর যেমন প্রত্যেক নারীর উপর ফরজ তেমনি দ্বিতীয় স্তরও ফরজে কেফায়া | অথ্যাৎ, উম্মতের বিশেষ এক নারী সম্প্রদায় যদি দ্বীনি ইলমে বুৎপত্তি অর্জন না করেন, নারীদের দৈনন্দিন হাজারো মাসআলা নিরসনে সময় ও পরিশ্রম ব্যয় না করেন, তাহলে প্রতিটি নারী উম্মত গুনাহগার হবে।

একটি ছোট দৃষ্টান্ত দেখা যাক যে, শিক্ষার্থী ক্লাসের সব বিষয়ের মৌলিক তথ্য গুলো Explain ছাড়া শুধু আয়ত্ব করে আসে সে পরিক্ষার হলে বিস্তারিত উত্তর লিখতে পারে না, ফলে তার নম্বরও মৌলিক তথ্যের উপর আসে। ব্যাখ্যা না করায় দেখা যায় সে ১০০ তে ৪০/৫০ নম্বর পায়। পক্ষান্তরে যে ছাত্রীটি প্রতিটি বিষেয়ে ব্যাখ্যা সহকারে আয়ত্ব করে পরিক্ষা দেয় সে পুরো ১০০ নম্বরের উত্তর দেয় এবং সে অনুযায়ী নম্বর পায়। কোন বিষয়ের মৌলিক তথ্য দুজনেই জানে তবে দ্বিতীয়জন পূর্ণরূপে জানে যদ্দরুন বোর্ড থেকে পরিদর্শক মহোদয় এলে সে সবার প্রতিনিধিত্ব করে এবং প্রতিষ্ঠানের মান বাঁচায়। এখন যদি অন্যরা বলে যে, এতো বিস্তারিত জেনে লাভ কি? মৌলিক শিক্ষা অর্জন হলেই তো যথেষ্ট। তাহলে অন্যরা অবশ্যই ভুল পথেই কেবল নয় বরং সারা জীবন ঐ বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞানের প্রয়োজনে উক্ত ভাল ছাত্রীর দারস্থ ও তার কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। আর দ্বীনি শিক্ষার দু'টি স্তরও অনুরূপ। দ্বিতীয়টি ছাড়া প্রথমটির (যা সীমীত) অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হওয়া অবধারিত। তাই দ্বিতীয়টির সুষ্ঠু পরিচর্যা একান্ত কাম্য। আর কওমী মাদরাসামূহ-ই সেই খেদমত সফলভাবে পরিচালনা করে আসছে।। যারা দ্বীনি ইলমে গভীরতা অর্জনের জন্য দ্বীনকে আল্লাহর যমীনে টিকিয়ে রাখার জন্য এ মহান ফরয কোন পার্থিব পদমর্যাদার সম্মান ও আর্থিক সম্মানের লোভ ছাড়াই মহান রবের সন্তুষ্টি

অর্জনের জন্য শিখে যাচ্ছে এবং সমাজ সংস্কারে নারীর নৈতিক আদর্শকে সমুন্নত রাখার প্রয়াসে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে , হাজারো সালাম সেসব নক্ষত্রসম মানবদের তরে।

প্রবন্ধের পরিশিষ্টে ইলমে ওহীর হক নিয়ে কিছু বলাটা দ্বীনি দায়িত্ব মনে করছি। আমাদের যারা ইলমে দ্বীন শিখছেন এই ইলমের কি হক এদের উপর বর্তায় এবং এই হক আদায় না করলে কি পরিণতি আমাদের বরণ করতে হবে? ইলমে ওহীর হক সম্পর্কে সূরা মায়েদায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন - يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته অর্থ-আপনার নিকটে আপনার রব যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রচার করুন। যদি তা না করেন তবে যেন আপনি রিসালাতের দায়িত্বই পৌঁছান নি। সূরা আর-রহমানে ইরশাদ হচ্ছে– علم القرآن অর্থ: তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। প্রথমোক্ত আয়াতে " যা অবতীর্ণ করা হয়েছে " তা ছিল কুরআন, ওহী এমন ইলম যা সরাসরি শিক্ষক মহান রাব্বুল আলামীন থেকে নবীজি (স:) পেয়েছেন। মহান রব এই ওহী অবতীর্ণের সাথে সাথে তার যিম্মাদারী বা হক সম্পর্কেও রাসুলকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং সম্বোধন করেছেন এভাবে– " যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আপনি তার প্রচার করুন।" অর্থাৎ ইলমের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা দেয়া, এটা এর অন্যতম হক। এ সম্পর্কে নবীজি সা: ও বিভিন্ন হাদীসে ইরশাদ করেছেন- যেমন তিনি বলেন-بلغوا عني و لو اية " আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও পৌঁছিয়ে দাও। অন্য এক হাদীসে এসেছে–تعلموا العلم والفراءض و علموه الناس فاني مقبوض "তোমরা ইলম ও ফারায়েযের জ্ঞান শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও, কেননা আমাকে তুলে নেয়া হবে।"আর আমরা তাঁর উম্মতের নির্বাচিত অংশ যারা নায়েবে রাসূল ও নবীর ওয়ারিশ " সম্মানজনক খেতাবে ভূষিত। আমাদের উপরেও ইলমে ওহী শিক্ষার এই হক্ব তথা প্রচার প্রসার এর দায়িত্ব বর্তাবে। উম্মত গোমরাহ হচ্ছে আর আমাদের হক্ব আমাদেরকে আহ্বান করছে। আমরা ইলমের প্রচার-প্রসারে অংশ নিয়ে দ্বীনি ইলমের এই হক্বকে আদায় করতে সচেষ্ট হই।

দ্বিতীয় অবশ্যপালনীয় হক্ব হলো, নিজ ইলম অনুযায়ী আমল করা। এ হক্কের ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।যেমন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন- من علم بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم - دلاءل النبوة للامام بيهقي "যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে অজানা বিষয়ের ইলম দান করবেন।।

অন্য হাদীসে এসেছে – ان مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما علمه و نشره "যেসব আমলের সওয়াব মুমিনের মৃত্যুর পরও সে পেতে থাকে, তার মধ্যে একটি হলো ঐ ইলম- যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে। আমরা নিজেদের দিকে একটু দেখি, আমরা পূর্ণরূপে দ্বীনের উপর চলতে পারছিতো? মাদরাসা থেকে বোরকা পড়ে বাসায় যাচ্ছি, সেখানে আমার চালচলন ঠিক আছে তো? যেহেতু ইলমে ওহী আমার সীনায়, উম্মত যেন আমাকে দেখে নিরাশ না হয়। ইলমে দ্বীন থেকে ওদের ভরসা যেন না ওঠে যায়। উপরন্তু বেপর্দা নারীরা পর্দানশীন হতে পারে এবং বেহায়াপনা লোপ পায়। এখন আমি যদি মাহরাম ছাড়া প্রয়োজনে–অপ্রয়োজনে ঘনঘন বাইরে ঘোরাফেরা করি, কন্ঠের পর্দা ভুলে গিয়ে উচ্চস্বরে জিনিসের দরদাম করতে থাকি, তাহলে ইলমে ওহীর যে হক্ব আমার উপর রয়েছে তার অপমান করলাম। মূলত: কথার দাওয়াত থেকে নিশ্চুপ দাওয়াত বেশি কার্যকরী। অতএব এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবার দরকার যে, এই হক্ব আমাদের দ্বারা আদায় না হলে কি হবে? প্রথমত: আল্লাহর আদেশের সুস্পষ্ট নাফরমানী হবে। যেখানে সূরা মায়েদাতে স্বয়ং নবীজিকে সাবধান করা হয়েছে তার হক্ব সম্পর্কে যে, "যদি কুরআনের তাবলীগ না করেন, তবে যেন রিসালাতের দ্বায়িত্বই আপনি পৌঁছান নি।" সেখানে আমরা কোন ছাড় পাব? উপরন্ত নবীজি সা. তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ করে গেছেন। যার প্রমাণ হলো তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে সোয়া লক্ষ সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে বলেছিলেন- اللهم اشهد এটাই জ্বলন্ত প্রমাণ।

বাকী রইল নবীর নায়েবগণ, তাঁদের জন্য এই সতর্কবাণী প্রত্যেকের উপর তার দায়িত্ব পূর্ণ না করা পর্যন্ত বহালথাকবে।

এবার দ্বিতীয় হক্ক সম্পর্কেও সচেতন থাকা চাই। তথা ইলম অনুযায়ী আমল করা যার ব্যাপারে উদাসীনদের সম্পর্কে ভয়ংকর সব ধমকি এসেছে। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- কতক জান্নাতী নিজেদের ধর্মীয় গুরুদেরকে দোযখে দেখে আশ্চর্য হলে, তারা তাদের সংশয় এ বলে দূর করবে যে, "আমরা অন্যদেরকে আমল করতে বলতাম কিন্তু নিজেরা আমল করতাম না।"

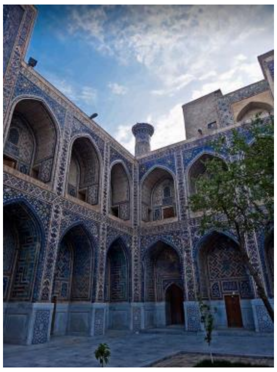
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে – ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لم ينتفع بعلمه "সেই আলেম কেয়ামতের দিন সবচেয়ে মন্দ বলে বিবেচিত হবে, যে নিজ ইলম দ্বারা উপকৃত হয়নি। অপর এক হাদীসে এসেছে- কেয়ামতের দিন ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের উভয় পা নিজস্থান থেকে সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তন্মধ্যে একটি হলো ইলম সম্পর্কে।

ومن علمه فيما عمل

" নিজের ইলমের উপর কি আমল করেছো?" অতএব, মুমিন মাত্রই এসব ধমকির প্রতি যথাযথ সজাগ থাকা চাই। আর আমরা যেহেতু ইলমে ওহীর ধারক-বাহক, উম্মাহর ঐ সকল মহীয়সী রমণীদের উত্তরসূরী, যারা স্বীয় ইলমের হক আমল ও প্রচারের মাধ্যমে আদায় করে ইতিহাসে চির স্মরণীয় ও সম্মানিত হয়ে রয়েছেন। আল্লাহ আমাদের ইলমের হক্ক বুঝে তা যথাযথভাবে আদায়ের তাওফিক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র: https://muslimbangla.com/article/200

দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য



শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার মাধ্যমে হযরত আদম আ. ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ তার রবকে চিনতে পারে, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা এবং হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। উন্নতি-অগ্রতি এবং উভয় জাহানের শান্তি-সফলতা ও কামিয়াবীর সোপানে আরোহণ করতে পারে । শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ "দ্বীনী ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।" (সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২২৪)

আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞজন (?) এই হাদীসে উল্লেখিত ইলম বা বিদ্যা দ্বারা ব্রিটিশ সিলেবাস তথা দুনিয়াবী শিক্ষা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, যা স্পষ্টই ভুল। কারণ যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ নিজের রবকে চিনতে পারে না , যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে পারে না, যে শিক্ষা গুনাহ থেকে বাঁচতে শিখায় না তাকে ইলম বলে না। দুনিয়াবী শিক্ষা তো দূরের কথা, দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরও কেউ যদি গুনাহ থেকে বেঁচে না থাকে, নিজেকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়তে না পারে, তাহলে তার শিক্ষাকেও শরীয়াতের দৃষ্টিতে ইলম বলা হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেনঃ 'নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে' (সূরা ফাতিরঃ২৮)। এই

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রকৃত আলেম তথা শিক্ষিত তারাই যারা আল্লাহকে ভয় করে। অতএব, ইলম তথা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হতে হবে খোদা ভীতির উপর আর দ্বীনী শিক্ষার ভিত্তিও হলো খোদা ভীতির উপর। তাই হাদীসে বর্ণিত ইলম দ্বারা যে খালেস দ্বীনী শিক্ষা উদ্দেশ্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে দুনিয়াবী বিদ্যা হাসিল করা কি জায়িয নেই? এর উত্তর হলো: ফরয পরিমাণ ইলম অর্জনের পরে কেউ যদি দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করে, চাই দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ হাসিলের জন্য করুক বা দ্বীনের খেদমতের নিয়তে করুক, তাতে কোনো সমস্যা নেই; বরং শরীয়ত মোতাবেক চলে দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে যদি কেউ দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করে তাহলে তাতে সে সাওয়াবেরও আশা করতে পারে। কারণ হাদীসে এসেছে 'কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে' (বুখারী হা.নং ১)

কিন্তু বাস্তব কথা হলো,স্কুল-কলেজে ফরয পরিমাণ ইলম শিক্ষা দেয়া হয় না এবং সেখানে শরীয়ত মোতাবেক চলতে উৎসাহিত করা হয় না; বরং সেখানে এমন অনেক মতবাদ শিক্ষা দেয়া হয় যা ঈমানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনেক স্কুলের পরিবেশই এমন যে, কেউ চাইলেও শরীয়ত মোতাবেক চলতে পারে না। এমতাবস্থায় দুনিয়ার ৬০-৭০ বছরের যিন্দেগীর কল্পিত সুখ-শান্তির আশায় নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে নৈতিকতা বিবর্জিত দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত হবে নাকি পরকালের অশেষ-অসীম যিন্দেগীর সুখ-শান্তি অর্জনের আশায় নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত হবে ? এর ফয়সালার ভার সুবিবেচকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হলো।

আজকাল লাখো মানুষ দ্বীনের সঠিক বুঝ না থাকার কারণে নিজের বুঝকে সঠিক মনে করে নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে দু- চার পয়সার লোভে কিংবা দুনিয়াবী সম্মানের আশায় দ্বীনী ইলম শিক্ষা না দিয়ে দুনিয়াবী শিক্ষা নামের ব্রিটিশদের তৈরি করা শিক্ষা কারিকুলাম পড়াচ্ছে।

আবার কেউ কেউ তো দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে নিম্নোক্ত মন্তব্য করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

১. '(কওমী) মাদরাসার বিদ্যা ফকীরি বিদ্যা' (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ কুরআন-হাদীসের ইলমের ব্যাপারে এমন মন্তব্য করার কারণে ঐ লোকের ঈমান ধ্বংস হওয়ার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।

২. 'মাদরাসায় লেখা-পড়া করলে না খেয়ে মরবে'। অথচ দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো লোক না খেয়ে মরেছে এর কোন প্রমাণ বা উদাহরণ তারা দেখাতে পারে না এবং পারবেও না ইনশাআল্লাহ। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদেরকে না খাইয়ে মারবেন না।

৩. কিছু দ্বীনদার (?) লোক মনে করে সন্তানকে (কওমী) মাদরাসায় পড়ানোর দরকার নেই। স্কুল-কলেজে পড়াবো। তারপর সন্তান বড় হলে তাকে দ্বীনের রাস্তায় মেহনত করার সুযোগ করে দিয়ে দ্বীনদার বানিয়ে নিব। অথচ স্কুলে পড়ে সে বদ্দীন হবেনা তার গ্যারান্টি কে দিবে? অথবা দ্বীনদার হওয়ার সুযোগ পাওয়ার আগেই সে মারা গেলে তার পরিণতি কী হবে? তা মোটেও ভেবে দেখে না।

মানুষ যাতে দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য বুঝতে পেরে নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে, তাই নিম্নে দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার মধ্যে বাস্তব কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর মহামানব তথা নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ অর্থাৎ তারা 'নায়েবে নবী'। কেননা নবী-রাসূলগণ শুধু ইলমের ওয়ারিশ বানান, অর্থ-কড়ির নয়। আর এরাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখে, টাকা-পয়সার জন্য নয়। (মাজমাউয যাওয়েদ হা.নং ৫২৩)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ঐ শিক্ষার সিলেবাস যারা তৈরি করেছে তাদের ওয়ারিশ। নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ নয়, কেননা তারা শিক্ষা অর্জনই করে টাকা-পয়সা কিংবা কোনো পদ হাসিলের জন্য।

২. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে নবীগণের বাস্তব ওয়ারিশ বানানোর জন্য তাদেরকে ঈমান, আমল, দাওয়াত, তা'লীম, তাযকিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে কীভাবে দুনিয়া উপার্জন করা যাবে তা শিক্ষা দেওয়া হয়। ঈমান-আমল সেখানে গুরুত্বহীন বিষয়।

৩. যারা দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় তাদের সম্মানার্থে ফেরেশতারা নিজেদের নূরের পাখা বিছিয়ে দেয়। (আবূ দাউদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার ছাত্রদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের পাখা বিছানোর কোনো হাদীস নেই।

৪. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যেহেতু ইবাদত-বন্দেগী করে থাকে, তাই তাদের দ্বারাই আল্লাহ তা'আলার দুনিয়াতে মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে মানুষ পাঠিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্য। (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কারণ তারা সাধারণত আল্লাহর নির্দেশ মতো চলে না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি উলামায়ে কেরামের সুহবতে আসে

আসে বা দাওয়াতের কাজে জুড়ে থাকে সেটা ভিন্ন কথা।

৫. খালেস দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কেউ বেকার থাকে না। তাদের কারণে দেশের বেকারত্ব বাড়ে না; বরং তারা একদিকে নিজ দেশে দ্বীনের খেদমত করছেন অন্য দিকে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইমাম, মুয়াযি্যন, মাদরাসার শিক্ষক হয়ে কিংবা অন্য কোন খেদমত করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন, যার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অনেকেই বেকার থাকছে। কারণ দুনিয়াবী শিক্ষাটা হলো 'কর্মমুখী শিক্ষা' অর্থাৎ এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা দুনিয়ার বিভিন্ন কর্ম করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে কর্মের সুযোগ কম থাকায় আর কর্মের প্রার্থী বেশি হওয়ায় অনেক বড় বড় ডিগ্রিধারীরাও বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষ অবধি বেকারত্বের কারণে কেউ অর্থ উপার্জনের অনৈতিক পথ বেছে নিচ্ছে, আবার কেউবা ছিনতাই রাহাজানির মতো ভয়ংকর পথ বেছে নিতে দ্বিধা করছে না।

৬. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষাকেন্দ্র কওমী মাদারেসে দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন পরিমাণ বাংলা, অংক, ইংরেজী ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়। আর এখানে সরকারের কোন অনুদান নেয়া হয় না। যার কারণে সরকার নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক এখানকার সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারে না।

পক্ষান্তরেঃ স্কুল-কলেজে প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া হয় না। আর স্কুল-কলেজ সরকারী হওয়ায় বা এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুদান গ্রহণ করায় সরকার চাইলেই নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারে। আর এতে যে কী পরিমাণ ক্ষতি হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭. কওমী মাদারেসে ফরযে আইন এবং ফরযে কেফায়া উভয় প্রকারের ইলম শিক্ষা দেয়া হয়, যার দ্বারা এখানকার শিক্ষার্থীরা নিজেকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা থেকে বাঁচাতে পারে আবার সাধারণ মানুষকেও সিরাতে মুস্তাকীম এর উপর পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষা কেন্দ্র স্কুল-কলেজে ইলমের কিছু তো নেই-ই; বরং তাদের সিলেবাসে ঈমান বিধ্বংসী অনেক মতবাদ রয়েছে। যার একটি মানাই ঈমান ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমনঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে বাংলাদেশের মূল সমস্যা বলে আখ্যায়িত করা।

৮ দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত অর্থে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদেরকে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, গুরুজন, প্রতিবেশী এমনকি প্রাণীর হকও শিক্ষা দেওয়া হয়। যার ফলে তারা প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে উঠে।

পক্ষান্তরেঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় না। পত্রিকা খুললেই স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্রদের কীর্তি (?) দেখে চোখ ধাঁদিয়ে যায়। আজকাল তো তারা বিশেষভাবে শিক্ষকদের পিটাতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। তাছাড়া ওখানকার ছাত্ররাই তো পথে-ঘাটে ইভ-টিজিং করে বেড়াচ্ছে।

৯. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা নিজ পিতা-মাতার জানাযা নামায পড়ানোর যোগ্যতাও অর্জন করে এবং কেবল তারাই সহীহভাবে পিতা-মাতার রূহে সাওয়াব রেসানী করতে পারে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত কোন লোকেরই এই যোগ্যতা নেই যে, সে ঐ বিদ্যা দিয়ে পিতা-মাতার জানাযা নামায পড়াবে বা তাদের রূহে সাওয়াব রেসানী করবে কিংবা তাদের মৃত্যুর পরের হকগুলো আদায় করবে।

১০. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা নিজ পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া স্বরূপ। অর্থাৎ পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও কিয়ামত পর্যন্ত আলেম তথা নেক সন্তানের নেক আমলের সওয়াব পেতে থাকবে। (তিরমিযী হা.নং ১৩৭৬)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই নিজ পিতা-মাতার জন্য গুনাহে জারিয়া স্বরূপ। অর্থাৎ পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও তাদের বদ আমলের ভাগীদার হতে থাকে। কারণ তারা তাদেরকে কোনো নেক আমল শিক্ষা দেয়নি এবং জীবিত অবস্থায় তাদেরকে গুনাহের কাজ করতে নিষেধ করেনি।

১১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা দুনিয়ার মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথ দেখায় এবং জান্নাতের রাহবারী করে। এজন্যই তারা বিভিন্ন মাদরাসা-মসজিদে, মাঠে-ময়দানে কুরআন-হাদীসের কথা জনসাধারণকে শুনিয়ে থাকে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই মানুষকে জাহান্নামের পথ দেখায়। যেমনঃ তারা নাটক, সিনেমা ইত্যাদি তৈরি করে তা দেখার জন্য মানুষকে প্রেক্ষাগৃহে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। অনেকে লেখনীর মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করে। তাছাড়া আরো অগণিত উদাহরণ আপনি ভাবলেই পেয়ে যাবেন।

১২. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যখন শিক্ষা অর্জনের জন্য বসে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়। (জামিউ বয়ানিল ইলম হা.নং ৪৫)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে এ ধরণের কোনো ফযিলত নেই; বরং তারা তো শিখতে বসে ক্লাস রুমেও অনেক গুনাহের কাজ করে। যেমনঃ ছেলেদের মেয়েদেরকে দেখা, মেয়েদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করা।

১৩. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ইসলাম ধর্ম টিকিয়ে রাখছে। কারণ ইলম শিক্ষার ধারা বন্ধ হয়ে গেলে ধীরে-ধীরে পৃথিবী থেকে ইসলাম উঠে যাবে। আর সাধারণ মানুষ যে যতটুকুই দ্বীন পালন করছে বা দ্বীনের চর্চা করছে তা এদের উসিলায় করছে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজদের অনুকরণ করে এবং তাদের অর্থে পরিচালিত এনজিওগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশে দিন দিন খৃষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে চলাই এর প্রমাণ বহন করে। সামান্য অর্থের লোভে বাংলাদেশী ছেলে-মেয়েরাই তো এসব এনজিওতে কাজ করছে।

১৪. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শেষ পরিণাম কল্যাণকর হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকেই দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। (জামেউ বয়ানিল ইলম হা.নং ৮০.)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের শেষ পরিণাম অজানা; বরং বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাদের শেষ পরিণাম সুখকর হবে না। যারা আল্লাহর হুকুম মানবে না তাদের শেষ পরিণতি খারাব হওয়াই স্বাভাবিক।

১৫. হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক 'দুনিয়ার গোটা সৃষ্টিজগত দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীর জন্য দু'আ করে'। (আবূ দাঊদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা এ দু'আ থেকে বঞ্চিত থাকে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহর পরিবারের সদস্য হওয়া তো দূরের কথা তারা অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর শত্রু সাব্যস্ত হয়ে যায়।

৩০. সর্বোপরি দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মাঝে খোদাভিরুতা, নম্রতা, ভদ্রতা, এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতার গুণ থাকার কারণে তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বিভিন্ন ফেতনায় জর্জরিত সমাজকে জাহিলিয়াতের অতল গহবর থেকে উঠিয়ে হেদায়েতের আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারে। আদর্শ, সুশীল সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যা দেশ ও জাতির জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষণ।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দ্বারা অসামাজিক কার্য-কলাপ। যেমনঃ হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাযানী, ধর্ষণ, ইভ-টিজিং, গাড়ী ভাংচুর, মারা-মারি, কাটা-কাটি, নেশা-মদ্যপান ইত্যাদি জঘন্য কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়ার কারণে আদর্শ সমাজও বর্বর যুগের অসভ্য সমাজে পরিণত হতে বাধ্য। আজ নৈতিকতা বিবর্জিত, ধর্মহীন শিক্ষার কারণেই দেশজুড়ে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তারপরও কি আমরা সন্তানদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করার দুঃসাহস দেখাতে পারি!

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার এবং নিজ অধীনস্থদের উক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র:http://www.darsemansoor.com/books/%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%80/

আলেমে দ্বীনের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

হাফেয আব্দুল মতীন - পিএইচ.ডি গবেষক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া ।

আল্লাহ রাববুল আলামীন যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন মানবজাতিকে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে যার ধারাবাহিকতা শেষ হয়েছে। অতঃপর যুগের পরম্পরায় নবীগণের উত্তরাধিকার হিসাবে ওলামায়ে কেরাম এ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

দ্বীনী ইলম দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রকার হ'ল দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান তথা ঈমান ও তা বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ, বিশুদ্ধ ও বাতিল আক্বীদা, তাওহীদ-শিরক, হালাল-হারাম, ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ফরয ইবাদত পালনের নিয়ম-পদ্ধতি সমূহ।[1] যে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।[2]

দ্বিতীয় প্রকার ইলম হ'ল দ্বীনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় গভীর জ্ঞান অর্জন। সমাজের কিছু মানুষকে আল্লাহ তা'আলা এ সৌভাগ্য দান করেন। যারা শরী'আতের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন এবং মানব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য উক্ত জ্ঞান বিতরণ করেন। এরূপ আলেমগণ ইহকালে ও পরকালে অসামান্য মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। কারণ তাঁরাই নববী দাওয়াতের প্রকৃত ধারক বা বাহক। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার দিক-নির্দেশনা দেওয়াই তাঁদের মৌলিক দায়িত্ব। আল্লাহ বলেন, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون 'অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহর নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে যাতে তারা সতর্ক হয়' (তওবা ৯/১২২)।

তবে একজন আলেমকে বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হ'তে হয়। প্রকৃত আলেম তিনি, যিনি আল্লাহ সম্পর্কে, তাঁর প্রেরিত জীবন-বিধান পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান রাখেন। যিনি মানুষের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করেন। যিনি কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে জ্ঞান অর্জন ও তার প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাকেই প্রকৃত আলেম বলা হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে আলেমে দ্বীনের মর্যাদা ও মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

আলেমে দ্বীনের মর্যাদা :

(১) আলেম ও জাহেলের মধ্যে পার্থক্য : ইলম আল্লাহ প্রদত্ত এক অফুরন্ত নে'মত। যা জ্ঞানী ও মূর্খদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون 'বলুন! যারা জানে এবং যারা জানে না তার কি সমান?' (যুমার ৩৯/৯)। তিনি অন্যত্র বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّور ''বলুন! অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হ'তে পারে? আলো ও অন্ধকার কি এক হ'তে পারে?' (রা'দ ১৩/১৬)।

(২) আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী : নবী-রাসূলগণ মানব সমাজের সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী সর্বোত্তম মানুষ। তাই আলেমদের সবচেয়ে বড় মর্যাদা হ'ল, রাসূল (ছাঃ) তাঁদেরকে নবীগণের উত্তরাধিকারী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا، وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ 'আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দীনার বা দিরহামকে উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যান না। বরং তারা রেখে গেছেন কেবল ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করেছে, সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে'।[3]

(৩) আলেমগণ দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও প্রভূত কল্যাণের অধিকারী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন'।**[4]** অতএব মহান আল্লাহ যার কল্যাণ চান, যাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে চান, তাঁকেই কেবল তিনি আলেম হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন।

আল্লাহ বলেন, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন' (মুজাদালাহ ৫৮/১১)।

তিনি আরো বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্ত্ততঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেউই উপদেশ গ্রহণ করে না' (বাক্বারাহ ২/২৬৯)।

(৪) প্রকৃত আলেমের জন্য জান্নাতের পথ সহজ হয়ে যায় : আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ 'যে ব্যক্তি ইলম হাছিলের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মাধ্যমে তাকে জান্নাতের পথ সমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম তলবকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানাসমূহ বিছিয়ে দেন। নিশ্চয়ই যারা আলেম তাদের জন্য আসমান ও যমীনে যারা আছে, তারা আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, এমনকি মাছ সমূহ পানির মধ্যে থেকেও তাদের জন্য দো'আ করে।[5]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ يُصَلُّونَ على مُعَلِّمِ الخَيْرِ حَتَّى حِيْتَانِ البَحْرِ 'মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদানকারীর জন্য সমগ্র সৃষ্টি, এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্তও তার জন্য দো'আ করে'।[6]

(৫) আলেমের মর্যাদা আবেদের চেয়ে বেশী : রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ 'আলেমগণের মর্যাদা আবেদগণের উপরে ঐরূপ, পূর্ণিমার রাতে চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য তারকাসমূহের উপরে যেরূপ'।**[7]**

ক্বাযী আয়ায বলেন, এই তুলনার কারণ এই যে, নক্ষত্রের আলো দ্বারা সে কেবল নিজেই আলোকিত হয়। কিন্তু চাঁদের আলো নিজেকে ছাড়াও অন্যকে আলোকিত করে। অনুরূপভাবে আবেদ তার ইবাদত দ্বারা কেবল নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায়। কিন্তু আলেম তার ইল্ম দ্বারা নিজে

যেমন উপকৃত হন, তেমনি অন্যকে উপকৃত করে থাকেন। আলেম উক্ত নূর লাভ করেন রাসূল (ছাঃ) থেকে। যেমন চন্দ্র জ্যোতি লাভ করে থাকে সূর্য থেকে। আর সূর্য কিরণ লাভ করে আল্লাহ থেকে। একইভাবে রাসূল (ছাঃ) 'অহি' লাভ করে থাকেন আল্লাহ থেকে' (মিরক্বাত)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, قَصْدٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ 'অধিক ইবাদত করার চেয়ে অধিক ইলম অর্জন করা উত্তম।**[8]**

আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে দু'জন লোকের কথা উল্লেখ করা হ'ল। যাদের একজন আলেম অপরজন আবেদ। তখন তিনি বলেন, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ 'আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর। যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের উপর'।**[9]**

(৬) ইলম বিতরণকারী আমলকারীর সমপরিমাণ নেকী লাভ করবেন : একজন আলেম লেখনী, শিক্ষাদান বা বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। ফলে যত মানুষ তার মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করবে, নেকীর কাজের দিশা পাবে এবং তদনুযায়ী আমল করে ছওয়াব অর্জন করবে, উক্ত আলেম তাদের সমপরিমাণ নেকী লাভে ধন্য হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ 'যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ছওয়াব পাবে, যে তার উপর আমল করবে। তবে আমলকারীর ছওয়াব থেকে সামান্যতমও কমানো হবে না'।[10]

এমনকি মৃত্যুর পরেও তিনি উক্ত নেকী লাভ করতে থাকবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। ১. প্রবাহমান দান ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং ৩. নেক সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'।[11]

আলেমে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য :

নিম্নে ওলামায়ে কেরামের উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) আল্লাহভীরু হওয়া : একজন আলেমের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হ'ল তিনি আল্লাহভীরু হবেন। আল্লাহভীতি ছাড়া পাহাড় পরিমাণ জ্ঞান কোনই কাজে আসবে না। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মূলতঃ আলেমরাই তাঁকে ভয় করে' (ফাতির ৩৫/২৮)। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، إِنَّمَا الْعِلْمُ الْخَشْيَةُ 'অধিক হাদীছ জানাই প্রকৃত জ্ঞানার্জন নয়। বরং প্রকৃত জ্ঞানার্জন হ'ল আল্লাহভীতি অর্জন করা।[12]

জনৈক আরবী কবি বলেন, لو كان للعلم شرف من دون التقي* لكان أشرف خلق الله إبليس 'যদি তাক্বওয়াবিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত, তবে ইবলীস আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হ'ত।**[13]**

জ্ঞানের অহংকার সবচেয়ে বড় অহংকার। তাই তাক্বওয়া বিহীন ইলম ব্যক্তির আত্মগরিমাকে পরিপুষ্ট করে। ফলে ঐ ইলম তার ক্ষতির কারণ হয়। অন্যদিকে তাক্বওয়াশীল আলেম সর্বদা বিনয়ী হন। ফৎওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তারা কখনো সর্বজান্তা ভাব প্রকাশ করেন না। বরং প্রতিটি আমলের ব্যাপারে, প্রতিটি ফৎওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তারা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেন। ভুল হয়ে যাওয়ার ভয়ে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন। তাই দেখা যায় যে ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) বিশ্ববিশ্রুত ইমাম হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ৪৮টি প্রশ্ন করা হ'লে ৩২টির জবাবে তিনি বলেন, لاَ أَدْرِي 'আমি জানি না'।[14]

(২) দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা : আলেমে দ্বীনের দায়িত্ব হ'ল মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের পূর্বে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান আহরণ করা। ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে 'কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন।[15]

অতএব কোন আমল সম্পাদন বা তার প্রতি মানুষকে দাওয়াত দানের পূর্বে সেসম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। অন্যথা সে ব্যাপারে চুপ থাকবে। বরং এসময় চুপ থাকাটাও প্রকৃত জ্ঞানের পরিচায়ক।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ. فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ لاَ أَعْلَم 'যে জানে সে যেন তাই বলে, আর যে জানে না সে যেন বলে, আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। কারণ এটাও একটা জ্ঞান যে, যার যে বিষয় জানা নেই সে বলবে, আমি এ বিষয়ে জানি না।[16] ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, مَن قال لاَ أَدْرِيْ فقد أحرز نصفَ العلم 'যে বলবে, আমি জানি না। সে অর্ধেক জ্ঞান অর্জন করল'।**[17]**

(৩) কুরআন ও সহীহ হাদীসের সিদ্ধান্তের নিরঙ্কুশ অনুসরণ :

আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا، 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক' (হাশর ৫৯/৭)। তিনি আরো বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيْنًا- 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' (আহযাব ৩৩/৩৬)।

অন্যত্র তিনি বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا- 'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' (নিসা ৪/৬৫)।

আলেমে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সহীহ হাদীস পেলেই তা গ্রহণ করা। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي؛ 'যখন সহীহ হাদীছ পাবে, যেনো সেটাই আমার মাযহাব'।**[18]** সাথে সাথে সকল প্রকার যঈফ ও

জাল হাদীছ থেকে সর্বোতভাবে দূরে থাকা। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল, সে তার নিজের স্থান জাহান্নামে করে নিল'।**[19]**

এছাড়া সকল প্রকার বিদ'আতী আক্বীদা ও আমল থেকে বিরত থাকা এবং মানুষকে বিশুদ্ধ ইসলামের পথে আহবান করা আলেমে দ্বীনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৪) নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী নীতি অনুসরণ করা : আলেমে দ্বীনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের নীতি অনুসরণ করা। নবী-রাসূলগণ মূলতঃ জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিরক বিমুক্ত তাওহীদ বিশ্বাস ও বিদ'আতমুক্ত আমলের দিকে মানুষকে আহবান করেছেন। আলেমগণ মানুষকে সেদিকেই আহবান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ- 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকটে আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক' (নাহল ১৬/৩৬)। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون 'আর আমরা তোমার পূর্বে কোন রাসূল প্রেরণ করিনি এই অহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর' (আম্বিয়া ২১/৮২৫)।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণকালে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, 'তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকটে যাচ্ছ। সুতরাং প্রথমে তাদেরকে এই সাক্ষ্য প্রদানের দাওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। যদি তারা তোমার এ দাওয়াত মেনে নেয় তাহ'লে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ দিন-রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার একথাও মেনে নেয়, তখন তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হ'তে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে'।[20]

(৫) সালাফে সালেহীনের পদাংক অনুসরণ করা : দ্বীনী বিধি-বিধান সাব্যস্তের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামকে সালাফগণের অনুসরণ করতে হবে। তথা শারঈ কোন বিষয়ে জানা ও বোঝার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সামনে রাখার সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে সেটি ব্যাখ্যা করেছেন এবং কিভাবে বুঝেছেন তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ কুরআন-হাদীছ থেকে বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজকে সামনে রাখতে হবে। এটাই শরী'আত গবেষণার মূলনীতি। এ নীতির ব্যত্যয় ঘটলে সিদ্ধান্তে ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে।

কারণ সাহাবায়ে কেরাম শারঈ বিধি-বিধান সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে গ্রহণ করেছেন, যথাযথভাবে অনুধাবন করেছেন এবং নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করেছেন। তারাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, خَيْرُ أُمَّتِيْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم 'আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ হ'ল আমার যুগের লোক (অর্থাৎ সাহাবীগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ তাবেঈগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ তাবে তাবেঈন)।**[21]**

(৬) ইখলাছ বজায় রাখা : আলেম দ্বীনের সকল কর্ম সকল ইবাদত হবে ইখলাছপূর্ণ। কারণ ইখলাছবিহীন কোন আমল আল্লাহ কবুল করেন না। আল্লাহ বলেন,قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ، ‘বল, আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আল্লাহর ইবাদত করি একনিষ্ঠভাবে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সহকারে’ (যুমার ৩৯/১১)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُه ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তার জন্য একনিষ্ঠভাবে সম্পাদিত ও তার সন্তুষ্টি কামনায় নিবেদিত আমল ব্যতীত কবুল করেন না’।[22]

অতএব দ্বীনী ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে পূর্ণ ইখলাছ বজায় রাখা আবশ্যক। কেউ যদি দুনিয়াবী কোন স্বার্থসিদ্ধি বা সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের জন্য ইলম অন্বেষণ করে, তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। কা‘ব ইবনু মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ، ‘যে ব্যক্তি আলেমদের উপর গৌরব করার জন্য অথবা মূর্খদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য, জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন’।**[23]**

তিনি বলেন, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ‘যে ইলম বা জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, কেউ সে জ্ঞান পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের অভিপ্রায়ে অর্জন করলে ক্বিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না’।[24]

(৭) ইলম অনুযায়ী আমল করা : ইলম অনুযায়ী আমল করা একজন আলেমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ তারা মানুষকে সৎ পথের দিকে আহবান করেন এবং অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করেন। এক্ষণে তারা যদি নিজেরাই তা পালন না করেন, তবে তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হ’তে পারে তা রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। যেখানে তিনি বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন জনৈক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়ী-ভূঁড়ি বেরিয়ে যাবে। তখন সে ঐ নাড়ী-ভূঁড়ির চতুর্দিকে ঘুরতে থাকবে। যেমনভাবে গাধা ঘানির চারদিকে ঘুরে থাকে। এ অবস্থা দেখে জাহান্নামবাসীরা তার চার পাশে জড়ো হবে ও তাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে অমুক! তোমার এ কি অবস্থা? তুমি না সর্বদা আমাদেরকে ভাল কাজের উপদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে? তখন লোকটি জবাবে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু নিজে তা করতাম না। আমি তোমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম; কিন্তু আমি নিজেই সে কাজ করতাম’।[25]

সাহল ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, যখন কোন মুমিন তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে, তখন তার ইলম তাকে তাক্বওয়া ও পরহেযগারিতার দিকে পথ প্রদর্শন করবে। আর যখন সে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে, তখন তার অন্তর আল্লাহ রাববুল আলামীনের সাথে যুক্ত হবে।[26]

(৮) হকের উপর অবিচল থাকা : আল্লাহ বলেন,اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ‘সত্য কেবল তোমার পালনকর্তার পক্ষ হ’তে আসে। অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না’ (আলে ইমরান ৩/৬০)। আলেমে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য হ’ল হকের উপর অটল থাকা। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ‘চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে’।[27]

(৯) উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া : আলেমগণ সর্বসাধারণের জন্য আদর্শ মানুষ হিসাবে গণ্য হন। তাই একজন আলেমের জন্য উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। সেকারণ আল্লাহ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম'।[28]

আলেমদের কখনোই কর্কশভাষী, অশ্লীলভাষী, বদমেজাজী হওয়া চলবে না। সেকারণ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (ছাঃ) - কে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ 'আপনি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার সংসর্গ হ'তে দূরে সরে যেত' (আলে ইমরান ১৫৯)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে আমলটি রাখা হবে তা হ'ল উত্তম চরিত্র। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন'।**[29]**

জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, আমাকে নছীহত করুন। তিনি বললেন, لاَ تَغْضَبْ 'তুমি রাগ কর না'। তিনি কয়েকবার একথাটি বললেন'।**[30]**

(১০) সহনশীল হওয়া : ওলামায়ে দ্বীনকে অবশ্যই ধৈর্যশীল, সহনশীল ও ঠান্ডা মাথার অধিকারী হ'তে হবে। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) আব্দুল কায়েস গোত্রের নেতা, আশাজ্জ মুনযির ইবনু আয়েযকে বললেন, إِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ 'তোমাদের মধ্যে এমন দু'টি ভাল গুণ রয়েছে, যাকে আল্লাহ পসন্দ করেন। তা হ'ল সহনশীলতা ও ধীর-স্থিরতা'।[31]

(১১) লজ্জাশীল ও নম্র হওয়া : ইমরান বিন হুছায়েন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ 'লজ্জা কল্যাণ বৈ কিছুই আনয়ন করে না'। তিনি বলেন, مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ 'যাকে কোমলতা ও নম্রতা হ'তে বঞ্চিত করা হয়, তাকে যাবতীয় কল্যাণ হ'তে বঞ্চিত করা হয়'।**[32]**

(১২) নিজের বিরুদ্ধে হ'লেও সর্বদা হক কথা বলা।

আলেমগণ সর্বদা হকের পথের দিশারী হবেন। যেমন কোন বক্তব্য বা ফতওয়া প্রদানের পর পরবর্তীতে যদি তা ভুল প্রমাণিত হয়, তবে তা থেকে ফিরে আসা এবং ভুল স্বীকার করে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান একজন আলেমের জন্য আবশ্যক। এক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখার জন্য ইলম গোপন করা, জেনেশুনে ভুল ফৎওয়া প্রদান করা চরম অন্যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ 'কাউকে তার জ্ঞাত কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে যদি সে তা গোপন রাখে, ক্বিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে'।[33]

উপসংহার :

উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যায় যে, আলেমগণ দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাদের মাধ্যমেই মানব সমাজ ঐশী হেদায়াতের আলোয় আলোকিত হয়ে থাকে। সেকারণ একজন আলেমের জন্য প্রবন্ধে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণ করা আবশ্যক। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণপূর্বক তোমার দ্বীন সঠিকভাবে বুঝার, তা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করার এবং তার প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার তাওফীক্ব দান কর এবং আলেমে দ্বীন হিসাবে কবুল কর- আমীন!

[1]. আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ হা/১৬৩।

[2]. রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রত্যেক মুসলিমের উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা ফরয’ (ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮)।

[3]. আবূদাঊদ হা/৩১৫৭; ইবনু মাজাহ ২/২২৩; তিরমিযী হা/২৬০৬, সনদ ছহীহ।

[4]. বুখারী হা/৭১।

[5]. আবু দাঊদ হা/৩৬৪১, মিশকাত হা/২১২ ‘ইলম’ অধ্যায়।

[6]. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৫২।

[7]. তিরমিযী, আবু দাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২১২ ‘ইলম’ অধ্যায়।

[8]. মিশকাত হা/২৫৫; ছহীহুল জামে‘ হা/১৭২৭, সনদ ছহীহ।

[9]. তিরমিযী হা/২৬৮৫; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; ছহীহ তারগীব হা/৮১; মিশকাত হা/২১৩;, সনদ ছহীহ।

[10]. ইবনু মাজাহ হা/২৪০, সনদ হাসান।

[11]. মুসলিম হা/১৬৩১; আবূদাঊদ হা/২৮৮০; নাসাঈ হা/৩৬৫১; তিরমিযী হা/১৩৭৬।

[12]. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, ১৪৭ পৃঃ।

[13]. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী, ১/১৩।

[14]. কুরতুবী, বাক্বারাহ ৩২ আয়াতের তাফসীর দ্র.।

[15]. বুখারী পৃঃ ১৬।

[16]. বুখারী হা/৪৭৭৪; মুসলিম হা/২৭৯৮; ছহীহ ইবনু হিববান ৬৫৮৫।

[17]. আবু ওছমান আল-জাহেয, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ১/৩১৪।

[18]. ইবনু আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার ১/১৬৭।

[19]. বুখারী হা/৬১৯৭; মুসলিম হা/৩; মিশকাত হা/১৯৮।

[20]. বুখারী হা/১৪৫৮; মুসলিম হা/১৯।

[21]. বুখারী হা/৩৬৫০; মুসলিম হা/২৫৩৩।

[22]. নাসাঈ হা/৩১৪০।

[23]. তিরমিযী হা/২৬৫৪; ছহীহুল জামে‘ হা/১০৬; মিশকাত হা/২২৫।

[24]. আহমাদ ৮২৫২; আবূদাউদ হা/৩৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/২৫২; ছহীহ তারগীব হা/১০৫; মিশকাত হা/২২৬।

[25]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৩৯, ‘সৎ কাজের নির্দেশ’ অনুচ্ছেদ।

[26]. হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/২০৫।

[27]. মুসলিম হা/১৯২০।

[28]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; বুখারী হা/৩৫৫৯; মিশকাত হা/৫০৭৫।

[29]. তিরমিযী হা/২০০২; মিশকাত হা/৫০৮১।

[30]. বুখারী হা/৬১১৬।

[31]. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৫৪।

[32]. মুসলিম হা/২৫৯২; মিশকাত হা/৫০৬৯।

[33]. আহমাদ ২/৭৮৮৩; আবূদাউদ ২/৩৬৫৮; তিরমিযী ২/২৬৪৯; ছহীহুল জামে‘ ৬২৮৪; মিশকাত হা/২২৩।

তথ্যসূত্র: https://at-tahreek.com/

ফরযে আইন ইলম শিক্ষা করা ছাড়া ঈমান শেখা যায় না!

আল্লামা আব্দুল মালেক দামাত বারাকাতুহু



হামদ ও ছানার পর :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

একটি মাসআলা আমরা সবাই শুনেছি, দ্বীনী ইল্ম হাছিল করা ফরয। হয়ত অনেকে এভাবে শুনেছি যে, ফরযের দুটো স্তর। ফরযে আইন, ফরযে কেফায়া। কিছু পরিমাণ ইলম ফরযে আইন, কিছু পরিমাণ ইলম ফরযে কেফায়াহ। ফরযে আইন ইলম বলতে বোঝায়, যে পরিমাণ ইলম সবার জন্য শেখা ফরয। আর ফরযে কেফায়া ইলম হল সেটা দ্বীনের ইলম, যা সবার জন্য শেখা ফরয নয়, তবে কিছুসংখ্যক আলেম এমন থাকা জরুরি যারা ফিকহ ও দলীল-আদিল্লা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। যাতে কারো প্রয়োজন হলে তাঁদের কাছ থেকে শিখতে পারে ও জানতে পারে।

আজকে আমরা ফরযে আইন ইলম সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমেই ঈমান, ইসলাম শিখতে হবে। এই শেখাটার প্রথম স্তর হল ফরযে আইন ইলম। আপনি যদি বলেন ঈমান শিখব, ইসলাম শিখব- এর মানেই হল যতটুকু ইলম ফরযে আইন ততটুকু শিখতে হবে। শেখার দুটি স্তর আছে। এক হচ্ছে, জ্ঞান অর্জন করা, আরেকটা হল প্রায়োগিক শিক্ষা। যা শিখবেন ওটার প্রয়োগ করার অনুশীলন করতে হবে। শুধু জ্ঞান অর্জন করলাম তাহলে এই শেখা পরিপূর্ণ হল না। ফরযে আইন যতটুকু ইলম, এর মধ্যেও দুটি স্তর আছে। একটা হল, জ্ঞান অর্জন আরেকটা হল, সেটার প্রায়োগিক শিক্ষা-অনুশীলন। তাহলে ফরয আদায় হবে। অন্যথায় ফরয আদায় হবে না। এই যে একটা শব্দ আমরা বলি, 'ঈমান শেখা' খুব দামী, কঠিন এবং গভীর একটা শব্দ। তো ঈমান শেখা বলতে গেলেই আমাকে ফরযে আইন ইলম শিখতে হবে। ফরযে আইন ইলম শেখার ব্যবস্থা না করে যতই ঈমান শেখার কথা বলি, ঈমান শেখা হবে না। এমনকি ফরযে আইনের উভয় পদ্ধতিতে; জ্ঞান অর্জন আর প্রায়োগিক অনুশীলন -এই উভয় স্তরের ফরযে আইন পরিমাণ ইলমের উপর মেহনত করলে ঈমান শেখা হবে, ইসলাম শেখা হবে।

এখন বুঝতে হবে, ফরয আইন ইলমের অধ্যায়গুলো কী কী।

ফরযে আইন ইলমের দুটো স্তর। জ্ঞান অর্জন ও প্রায়োগিক অনুশীলন। এখন বলছি ফরযে আইন ইলম দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ইলম শুরু হয় ঈমান আনার পরেই। যে আল্লাহর মেহেরবানীতে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে সে শুরু থেকেই ঈমানওয়ালা, ইসলাম ওয়ালা। তো ঈমান আনার পর থেকে, ইসলাম সম্পর্কে বোধ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই এই অংশের ইলম অর্জন শুরু করতে হবে। এক দিনের এক সপ্তাহের এক মাসে আমি শিখে শেষ করতে পারব না। ঠিক আছে। এক সপ্তাহে সব শিখে ফেল- শরীয়ত এটা বলে না। কিন্তু শিখতে থাকতে হবে। বাদ দেওয়া

যাবে না। এমনিই তো আমরা ছুটি পাই। যেমন, আজকের দিন পুরা ইলমের জন্য আমরা ওয়াক্ফ করেছি, কিন্তু এর মধ্যেও কি ছুটি পাইনি আমরা? ছুটি দিতে হবে। ছুটি না দিলে আমরা লাগাতার কীভাবে কাজ করব? আমরা রোযা রাখি। তাতে কি ছুটি নেই? প্রথম ছুটি তো ইফতার। ইফতারের পর থেকে আবার সেহরীর শেষ পর্যন্ত ছুটি। নামায ফরযে আইন। কিন্তু ছুটি আছে। ফজরের নামাযের পর থেকে লম্বা ছুটি যোহর পর্যন্ত। যোহরের পর থেকে আছর পর্যন্ত মোটামুটি লম্বা ছুটি। আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ছুটি। মাগরিবের পর থেকে ইশা পর্যন্ত। আমাদের দেশে তো ইশা আগে আগে পড়ে, এজন্য কম ছুটি। ইশা আরো দেরীতে পড়লে আরো ছুটি। আর ইশার পর থেকে একেবারে ফজর পর্যন্ত ছুটি। আল্লাহ তাআলা কত আসান করেছেন। দ্বীন বুঝার, দ্বীন শেখার এবং দ্বীনের উপর চলার যদি কারো ইচ্ছা থাকে, নিয়ত থাকে তাহলে কি কঠিন? নিয়ত না থাকলে তো সহজ থেকে সহজ বিষয়ও কঠিন। যাই হোক, বলছিলাম দ্বীন শিখতে থাকতে হবে। দ্বীন শেখা বাদ দেওয়া যাবে না। মানে হল, আপনি ভুলে যেতে পারবেন না। এক সপ্তাহে একটু শিখলেন, তারপর আর খবর নেই, ভুলে গেছেন। আমাদের ফরয ইলমের যে অনেক বাকি আছে, তার খবর নেই। ভুলেই গেছে। এটা কি জায়েয হবে? জায়েয হবে না। চলতে থাকতে হবে। ছুটি নিতে পারব, কিন্তু একেবারে ভুলে যেতে পারব না। এক সপ্তাহ একটু শিখলাম তারপর তিন দিনের ছুটি বা আরো এক সপ্তাহের ছুটি, ঠিক আছে, এক সপ্তাহ পর আসুন। আরেকটু শিখুন। কিন্তু একদিন একটু শিখলাম, তারপর মাসকে মাস পার হয়ে গেল, বছরকে বছর পার হয়ে গেল, আর কোনো খবর নেই, এটা কি ছুটি নেওয়া হল, না ভুলে যাওয়া হল? ভুলে যাওয়া যাবে না। ফরযে আইন ইলমের যতক্ষণ একটা অংশও বাকি আছে, যেটা আমি শিখিনি, ততক্ষণ পর্যন্ত ভুলে যাওয়া যাবে না। চালিয়ে যেতে হবে। অবহেলা করতে পারবেন না। এটা হল এক প্রকার ফরয ইলম।

আরেক প্রকার, যখন যে কাজ তখন সেটা শেখা ফরয। দেরি করা যাবে না। আগের প্রকার তো বললাম, সেটা ছুটি নিয়ে নিয়ে শিখতে থাকেন। কিন্তু অবহেলা করে ভুলে যাওয়া যাবে না। আরেক প্রকার ফরযে আইন ইলম হল, যেটা নগদ দরকার সেটা নগদ শিখতে হবে। দেরি করা যাবে না। একজন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে, ভালো কথা। কিন্তু ব্যবসার মধ্যে তো দু'প্রকার আছে, হালাল ও হারাম। আরেক প্রকার আছে হারাম ও হালালের মিশ্রণ। এখন আমাকে জানতে তো হবে যে, এটা হালাল, এটা হারাম, এটা সন্দেহযুক্ত। এমন কিছু যদি করি যাতে হালাল-হারাম মিশ্রিত- এটা করা যাবে না। কিছু ব্যবসা আছে যা আগাগোড়াই হারাম। কাজেই কোনটা হালাল, কোনটা হারাম তা জানতে হবে। আমি ব্যবসা শুরু করব এখন আর শিখব এক বছর পর, এক বছর শেখা ছাড়াই ব্যবসা চালাব, এটা হয় না।

ব্যবসার কিছু বিষয় আছে কৌশলগত। কিছু আছে ব্যবস্থাপনাগত। ব্যবস্থাপনাগত বিষয় আপনি অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর কাছে শেখেন বা কিছুদিন বড় ভাইয়ের দোকানে বসে তার কাছ থেকে শেখেন। কিন্তু হারাম-হালালের বিষয়গুলো আলেমের কাছ থেকে শিখতে হবে। ব্যবসা খুলে দিলেন কিন্তু ব্যবসার হারাম-হালাল জানলেন না, ফরযে আইন লংঘন হল। ব্যবসায় ঢুকেননি তাহলে ব্যবসার হালাল-হারাম সম্পর্কে আরো দেরিতে জানলেও অসুবিধা নেই। কিন্তু যখন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছেন তখন আর দেরি করার সুযোগ নেই। ব্যবসা শুরু করবেন এই সপ্তাহে, ব্যবসার হালাল-হারাম জানবেন কি এক সপ্তাহ পর, একমাস পর? না এখনই। তো এটা হচ্ছে আরেক প্রকারের ফরযে আইন ইলম। মানে যা আমাকে এখনই জানতে হবে। দেরি করা যাবে না।

একজন হজ্বে যাওয়ার নিয়ত করেছে। তো হজ্বের পদ্ধতি শিখতে হবে না? এটা নগদ দরকার, দেরি করা যাবে না। হজ্বের ইহরাম বেঁধে ফেললাম, রওয়ানাও হয়ে গেলাম। কিন্তু খবর নেই যে, ইহরাম কাকে বলে। অনেকে মনে করে, সাদা দুটো কাপড় পরিধানের নামই ইহরাম। লোকে বলে ইহরাম বাঁধা। আর মনে করে কাপড় বাঁধাই হল ইহরাম বাঁধা। যেমন বলা হয় নামাযের নিয়ত বাঁধা। ওখানে কী বাঁধে? হাত বাঁধে। আসলে নিয়ত বাঁধা মানে নিয়ত করা। এই না যে, কোনো কিছু দিয়ে বেঁধে ফেলা। তো ইহরাম বাঁধার মানে হল, হজ্বের ইহরাম করা। কীভাবে তা করবে আর এর কারণে নতুন কী কী বিধান আসবে, এগুলো জানতে হবে। কিন্তু দেখা যায়, অনেকের এগুলো কিছুই জানা থাকে না।

একবার বিমানবন্দরে গেলাম একজনকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য। হজ্বে যাচ্ছিলেন। ওখানে একজন জিজ্ঞাসা করল, এক বেচারা ইহরামের কাপড় লাগেজে দিয়ে দিয়েছে। লাগেজ চলে গেছে ভেতরে। সঙ্গে ছোট ব্যাগে ইহরামের কাপড় রাখেনি। বাড়ি থেকে ইহরাম বেঁধে যায়নি। এটা ঠিক যে ইহরাম বাড়ি থেকে বেঁধে না আসারও অবকাশ আছে। ইহরাম বাঁধার শেষ একটা জায়গা আছে। যে যে দেশ থেকেই মক্কা শরীফে আসুক। একটা শেষ সীমানা আছে। ওখানে এসে ইহরাম বাঁধতেই হবে। ইহরাম না বেঁধে ওই মীকাত অর্থাৎ ঐ জায়গা অতিক্রম করা যায় না। বিমান ঢাকা থেকে রওয়ানা হলে পাঁচ ঘন্টা সাড়ে পাঁচ ঘন্টার মত সময় লাগে। জিদ্দা পৌঁছার আগেই ঐ জায়গাটা এসে যায়। তো এখন কেউ বাসা থেকে ইহরাম বাঁধল না, বিমান বন্দর থেকেও করল না, কিন্তু জেদ্দায় পৌঁছার ঘন্টা খানিক আগে তার ইহরাম বাঁধতে হবে। নতুবা তার ঐ সীমানা অতিক্রম করতে হবে ইহরাম ছাড়া; এটা

নাজায়েয। এমন হয়ে গেলে কী করতে হবে সে মাসআলাও আছে। তো চাইলে এই অবস্থাতেও ইহরাম বাঁধা যায়, নিয়ত করে লব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক··· বললে ইহরাম হয়ে গেল। কিন্তু সে তো সাধারণ পোষাক পরে আছে। ইহরাম অবস্থায় পুরুষ এই সাধারণ পোষাক পরে থাকতে পারে না। এখন করবে কী? এটা কি নগদ মাসআলা হল না? এটাও শিখেনি, হজ্বে রওয়ানা করেছে। এখন কে বলবে মাসআলা? তো একজন মুফতী সাহেব ছিলেন, বলে দিয়েছেন মাসআলা- যে আপনি বিমানে বসে ঘন্টা দুয়েক পর নিয়ত করে তালবিয়া পড়বেন। আপনার ইহরাম শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এই ২/৩ ঘন্টা ইহরামের পরিপন্থী হালতে থাকবেন এটা ওযর। এখন করবেন কী, ভুল হয়ে গেছে। ইস্তেগফার পড়তে থাকবেন আর ওখানে গিয়ে কাপড় হাতে পাওয়ার পরপরই ইহরামের কাপড় পরে নিবেন। আর কয়েকঘন্টা ইহরাম পরিপন্থী হালতে ছিলেন এর জন্য যে জরিমানা আসে তা আদায় করবেন।

তো ভালো যে, মুফতী সাহেবকে পেয়েছেন। না পেলে তিনি কী করতেন? অনেকে ইহরামের জন্য কাপড়কেই মূল মনে করে। কাজেই সে ভাবত যে, কাপড়ই যেহেতু নেই আমি আর কী করব? জিদ্দায় যাই, তারপর ইহরাম বাঁধব। অথচ ওটা করলে ডবল গুনাহ হত।

তো আমি বলছিলাম, যে ইলম আপনার এখন দরকার, সেটা আপনাকে এখনই শিখতে হবে। একেক জনের একেক যরুরত। যে ব্যবসায় নামবে তার ব্যবসারটা দরকার। যে হজ্বে যাচ্ছে তার হজ্বেরটা দরকার। এরকম একেক জনের একেক বিষয়ের ইলম দরকার।

একজন চাকরি নেবে, আগে কোথাও চাকরি করেনি। এই প্রথম চাকরি; তাকে চাকরির মাসায়েল জানতে হবে। আমি একজন চাকরিজীবি হিসেবে, একজন কর্মচারী বা কর্মকর্তা হিসেবে যেই স্তরের হই না কেন- আমার উপর তো কিছু দায়-দয়িত্ব আসে। কী কী দায়িত্ব আসে? সকাল এতটায় যেতে হবে, এতটায় ফিরতে হবে। অফিস সময়গুলো বলে দিল। এ সময়টা অফিসের দেওয়া সময়। এটা পালন না করলে শুধু কর্তা নারায হবে, মালিকপক্ষ নারায হবে, এইটুকু? না, এ সময়টা অফিসে না দিলে আল্লাহও নারায হবেন? এই বিষয়টা তো আমাকে জানতে হবে। যার যে পেশা সেই পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান জানতে হবে।

একজন সেলুন খুলছে। এটা তার পেশা। কিন্তু কেউ কি সেলুন খোলার পর মুফতী সাহেবের কাছে যায় যে, হুযুর আমি একটি সেলুন খুলেছি, এটা আমার আয়ের উৎস। আমাকে এ সংক্রান্ত মাসায়েল বলুন? কারণ হুযুরের কাছে গেলে হুযুর বলবেনযে, কারো দাড়ি কামাতে পারবে না। মানুষ এসে ভীড় করুক দাড়ি কামানোর জন্য, তুমি পারবে না। দাড়ি কামালে তো টাকা দেয়, সেটা হালাল না হারাম, কী হুকুম? এগুলি জানতে গেলে তো অসুবিধা! একজন দোকানদার কত পণ্য-সামগ্রী তার দোকানে রাখে। কোনটা দোকানে রাখা ও বিক্রি করা জায়েয, কোনটা জায়েয নয়- মাসআলা জানতে হবে। জানতে আসলেই হয়ে যায়। আমি যে আয়াত পড়লাম-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً

হে ঈমানদারগণ! (যারা ঈমান এনেছো), তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। -সূরা বাকারা (২) : ২০৮

পূর্ণ ইসলামকে বিশ্বাস কর। পূর্ণ ইসলামকে গ্রহণ কর। পূর্ণ ইসলামকে মান। গ্রহণ করতে, মানতেই যদি অসুবিধা তাহলে তো ঈমান হল না। আর যদি গ্রহণ করে, মানে কিন্তু আমল করতে গেলে ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যায়। বিভিন্ন কারণে করতে পারে না। নিজেকে অপরাধী মনে করে, তাহলে ঈমান আছে কিন্তু আমলের ত্রুটি। আর যদি গ্রহণই না করে এবং বলে নামায রোযার কথা হুযুররা বলে, ঠিক আছে, এখন দেখি আমার একটা সেলুন আছে, হুযুররা এটার উপরও কথা বলা শুরু করেছে, এটাও নাকি আমার হুযু্রদের কাছে শিখতে হবে? এটা তো শিখব ভালো নাপিতের কাছে। হুযুরদের কাছে এটা শেখার কী?

শুনুন, ভালো নাপিতের কাছে শিখবেন, কীভাবে কাঁচি ধরবেন, কীভাবে চালাবেন- এগুলো। এটা নাপিতের কাছে যাওয়া ছাড়া শেখা যাবে না। একটা কিসসা বলি। এক নাপিত বাদশার চুল-মোঁচ ঠিকঠাক করত। একদিন বাদশা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তো নাপিত এসে বাদশাকে ঘুমের মধ্যে রেখেই চুল কাটা শুরু করল। এবং যেভাবে করা দরকার করে দিল। ঘুম থেকে উঠে বাদশা আশ্চর্য হয়ে গেলেন, আরে! নাপিত এসেছিল? কীভাবে করল সে? আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, টেরই পেলাম না, ঘুমও ভাঙ্গল না! এ তো নাপিতদের বাদশা। হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ. কিসসাটা বর্ণনা করেছেন। ঘটনা তো ঘটনাই, সম্ভবত এটা বাস্তব ঘটনা হবে। তো বাদশা যখন সনদ দিলেন যে, 'নাপিতদের বাদশা', তো বাদশাহর কথা নাপিতের জন্য খুব সম্মানের বিষয়। কথাটা খুব মশহুর হয়ে গেল। এখন অন্যান্য নাপিতের স্ত্রীরা এসে এ নাপিতের বউকে, মোবারকবাদ জানাচ্ছে যে, বাদশা তোমার স্বামীকে 'নাপিতের বাদশা' বলেছেন। তখন এই নাপিত বা তার স্ত্রী মন্তব্য করল, বাদশা তো বাদশাই। কোন্ নাপিত তার পেশাতে বড়, এটা বাদশা বুঝবেন না, এটা তার বিষয় না। এই পেশার যারা গুরু তারা কেউ এই সনদ দিলে এর মূল্য ছিল। কিন্তু এই সনদ দিয়েছেন দেশের বাদশা। এটা তো তাঁর বিষয় নয়।

বুঝতে পেরেছেন? বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান ছাহেব দা. বা. এই ঘটনা অনেক বলেন। আমরা বলি না যে, অমুক হুযুর অনেক বড় আলেম, অমুক হুযুর অনেক বড় বুযুর্গ। আমি কী বুঝি- তিনি অনেক বড় আলেম না ছোট আলেম। এটা তো আরেক আলেমই বুঝবেন। তো আমি বলছিলাম এই যে, এত পারদর্শিতা সে অর্জন করেছে যে, ঘুমন্ত অবস্থায় একজনের চুল-মোঁচ কেটে দিয়েছে, ঘুম ভাঙেনি, এটা কি ছোটখাট কোনো পা-িত্য? এটা কোনো হুযুরের কাছে শিখতে হবে? সেলুনওয়ালাদেরকে আমরা বলি না যে, এটা হুযুরের কাছে শিখতে আস। এটা তো নাপিতের কাছেই শিখতে হবে। হুযু্রের কাছে যা শিখতে হবে, তা হল, সেলুনের জন্য যদি সে দোকান ভাড়া নিয়ে থাকে সে ভাড়া সংক্রান্ত মাসআলা জেনে নিবে। একজন মহিলা এসে তার চুল ছোট করে দিতে বলল, এটা করা তার জন্য জায়েয হবে, নাকি হবে না- হুযুরের কাছে জানতে হবে। নাপিত হলো পুরুষ, এসেছে মহিলা; তাও আবার মাথার চুল ছোট করার জন্য?!

চুলের বিভিন্ন ঢং দেখবেন সেলুনে। বিভিন্নজনের কাছে বিভিন্ন ঢং ভালো লাগে। এগুলোর অনেকগুলোই অনুত্তম। কিছু কিছু আছে, নাজায়েয। ঢালাওভাবে সবগুলোকে না জায়েয বলা যায় না। আমরা যেভাবে চুল রাখি, হয় বাবরী চুল আর না হয় ছোট করে সামনে পেছনে বরাবর করে রাখি। একেবারে স্বাভাবিক। এটা হল সুন্দর পদ্ধতি। এর ব্যতিক্রম হলে হারাম হবে- তাও বলছি না। কিন্তু ব্যতিক্রমের মধ্যে যা যা আছে, সবগুলো জায়েয ফ্যাশনে পড়ে না। কিছু না জায়েযও আছে, সেটা জানতে হবে। যে এমন ফ্যাশন করতে চায় তারও জানতে হবে আর যে এমন ফ্যাশন করে দেবে তারও জানতে হবে।

বিউটি পার্লার আছে না? ওখানে কী কী কর্মকা- হয়? কোনো পার্লারওয়ালা তো দারুল ইফতায় আসে না। ফরযে আইন লংঘন। আরে ভয় পাওয়ার কী আছে? তুমি মাসআলা জান। আমল যদি করতে নাই পার নিজেকে অপরাধী মনে কর। নিজেকে অপরাধী মনে করলেও তো গুনাহ কমল। কিন্তু না জায়েযকে জায়েয মনে করে করা? মানুষ জানতে ভয় পায়। জানতে ভয় পাওয়া ঠিক নয়। হালাল হারামের খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। আমলের মধ্যে যদি ত্রুটি হয়েও যায়, নিজেকে তো অন্তত অপরাধী মনে করব। এটুকু লাভ তো হল। কিন্তু যদি আমি না-ই জানি তাহলে

তো হারামকে হালাল মনে করব। নাজায়েযকে জায়েয মনে করব। এটা তো আরো বড় সমস্যা। এজন্যই বললাম, যার যেটা পেশা, যার যেটা কর্মক্ষেত্র তাকে ঐ বিষয়ের ইলম অর্জন করতে হবে। তদ্রূপ যার যেই হক এখন তার উপর এসেছে- সে সম্পর্কে জানতে হবে।

বাবা হয়ে গেলাম কিন্তু কোনো মাসআলা জানারই যরুরত মনে করলাম না। একজন স্বামী হয়ে গেল, কোন মাথাব্যাথা নেই তার মাসআলা জানার ব্যাপারে। মেয়েকে যখন বিয়ে দেওয়া হল, স্ত্রী হিসেবে তার উপর কী কী মাসআলা আসছে জানার যরুরত মনে করা হল না। বাবা ইন্তেকাল করেছে, মীরাসের মাসআলা জানার যরুরত মনে করা হল না। এরকম কত ক্ষেত্র, কয়টা বলব? কয়েকটি উদাহরণ দিলাম। যে যে পেশায় থাকুক সে পেশা সংক্রান্ত শরীয়তের মাসআলা থাকবে। কেউ কৃষক; এ বিষয়ে কত মাসআলা। আবার কেউ আইনজিবী; তারা শুধু লয়ারদের কাছেই প্র্যাকটিস করতে যায় কিন্তু তাদের কম লোকই হয়ত হুযুরদের কাছে আসা জরুরি মনে করে। আমার যদি মজবুত মাধ্যম থাকত সব আইনজিবী-উকিলদের কানে এই আয়াতের পয়গাম পৌঁছে দিতাম-

وَ لَا تَكُنْ لِّلْخَآىِٕنِيْنَ خَصِيْمًا

আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষ অবলম্বন করো না। -সূরা নিসা (৪) : ১০৫

যদি উকিলরা এই বিধানটির উপর আমল করত তাহলে যেসব ক্ষেত্রে বাদি-বিবাদির এক পক্ষ নিশ্চিত জালিম, তার কি নিজের জন্য উকিল পাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল?

আমি একটা ইবাদত শুরু করলাম, কীভাবে করব? যে কাজ আমি করতে চাই, সে কাজের ক্ষেত্রে কী কী বিধান আছে, জীবনের কোন্ অবস্থায় কী বিধান- আরবীতে এটাকে বলে 'ইলমুল হাল', মানে নগদ অবস্থায় তোমার কী বিধান জানা দরকার; কী বিধান তোমার উপর আরোপিত হচ্ছে, সে বিধান সম্পর্কে জানা ফরযে আইন।

নগদ ফরয। এটা ফরযে আইন ইলমের এক প্রকার। আরেক প্রকার যা এখনের বিষয় না, তখনের বিষয় না, সব সময়ের বিষয়। সেটা আস্তে আস্তে শিখে ফেলতে হবে। সেটা হল আকীদার বিষয়। এক নম্বরে আকীদা। এটা জানা ফরযে আইন। দ্বিতীয় নম্বর হল ফরযসমূহ; ইসলাম কী কী বিষয় ফরয করেছে। ফরযের তালিকা জানা থাকতে হবে। ইসলাম কী কী জিনিস হারাম করেছে, হারামের তালিকা জানতে হবে। তাহলে এক নম্বরে হল আকীদাতুল ইসলাম, যা মক্তবে পড়ে এসেছেন; ঈমানে মুজমাল-

آمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بأسمائه وَصِفَاتِه.

আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, আল্লাহ তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীসহ যেভাবে আছেন। وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِه وَأَرْكَانِه এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম আমি মেনে নিলাম। এটা হল সংক্ষিপ্ত। আরেকটু বিস্তারিত হল ঈমানে মুফাসসাল-

آمَنْتُ بِاللهِ، وملائكته، وَكُتُبِه، وَرَسُلِه، وَالْيَوْمِ الْاخِرِ، وَالْقَدْرِ خَيْرِه وَشَرِّه مِنَ اللهِ تَعَالى، وَالْبَعْثِ بَعْدَالْمَوْت.

এগুলো ইসলামের আকীদা। আমরা চাই যে মক্তবে উস্তাদযী আমাকে যে আকীদার শুধু নামগুলো শিখিয়েছেন, ব্যস ঐটুকু নিয়েই কবরে যেতে। আল্লাহর প্রতি ঈমান, ফেরেশতার প্রতি ঈমান, কিতাবের প্রতি ঈমান এগুলো তো শুধু শিরোনাম। এগুলোর অর্থ কী? কী অর্থ আল্লাহর প্রতি ঈমানের? এই যে বললাম كَمَا هُوَ بأسمائه وَصِفَاتِه

'যেমন আল্লাহর নাম ও গুণাবলী' সেভাবে আমি ঈমান আনলাম। কিন্তু সেই নাম ও গুণাবলী কী? মক্তবে তো তা বলা হয়নি। আর আপনি চাচ্ছেন এভাবেই কবরে চলে যেতে। এই আকীদার প্রত্যেকটি নামের অধীনে এর বিশ্লেষণ আছে। ঈমান বিল্লাহ কী? ১-২-৩-৪-৫ এগুলো সবকটা মিলে ঈমান বিল্লাহ। কুরআনের প্রতি ঈমান মানে কী? ১,২,৩,৪,৫ এই কতগুলো বিষয় নিয়ে কুআনের উপর ঈমান। বিস্তারিত আকীদা যদি অন্তরে থাকে তাহলে আল্লাহর প্রতি ঈমান হল, কুরআনের প্রতি ঈমান হল। ভাই বলুন দেখি আল্লাহর প্রতি ঈমান মানে কী? তা তো জানি না। তো আকীদার শুধু নামগুলোই মুখস্থ করে কি কবরে যেতে চাই? কুরআন ও হাদীসে প্রতিটির যে বিশ্লেষণ আছে তা কি জানতে হবে না? এটা হল 'আকীদাতুল ইসলাম'।

ফরযে আইন ইলমের প্রথম বিষয় হল আকীদাতুল ইসলাম। দ্বিতীয় কথা 'ফারায়েযুল ইসলাম'। কুরআন-হাদীসে আল্লাহ আমার উপর কী কী জিনিস ফরজ করেছেন, একজন মুসলিমের উপর কী কী জিনিস ফরয এগুলো জানতে হবে। তৃতীয়ত, ইসলাম তার অনুসারীদের উপর কী কী জিনিস হারাম করেছে? সগীরা গুনাহ, কবীরা গুনাহ সবই তো গুনাহ। হারাম, মাকরূহে তাহরীমী, মাকরূহে তানযীহী সবই তো বর্জনীয়। কিন্তু বর্জনীয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ কী? হারাম এবং মাকরূহে তাহরীমী। এগুলোর তালিকা আমার জানা থাকতে হবে না? তা হল- আকীদাতুল ইসলাম, ফারায়েযুল ইসলাম, মাহারিমুল ইসলাম এই বিষয়গুলো।

আরেকটি শিরোনাম হচ্ছে 'আদাবুল ইসলাম'-ইসলামের আদব। কোন্ ক্ষেত্রে কী আদব-কায়েদা ইসলাম জানিয়েছে এগুলো শিখে ফেলতে হবে। বলে, হুযুর আদব তো আর ফরয না। কোনো কোনো আদব আছে ফরযেরও দাদা। আদব পরিপন্থী কোনো কিছু করাকে কী বলে? বেয়াদবী বলে। সব বেয়াদবী কী জায়েয? কত বেয়াদবী আছে তো হারাম, কত বেয়াদবী আছে এর কারণে ঈমানই চলে যায়। তাহলে আদব শেখা কি মামুলী কথা, না গুরুত্বপূর্ণ কথা? ইসলামের আদবগুলো শিখতে হবে। কোন ক্ষেত্রে কী আদব শিখিয়েছে ইসলাম তা জানতে হবে। প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব আদব রক্ষা করা সব সময় জরুরি নয়। ফরয নয়। কিন্তু আদব জানা থাকা, ইসলামের আদব জানা থাকা ফরয। সব আদব এক মাপের নয়। কিছু আদব আছে ফরয, কিছু আদব আছে মুস্তাহাব। মুস্তাহাব যেটা সেটাতো আর ফরয নয়। কিন্তু আপনার জানা তো থাকতে হবে যে ঐ আদব ফরয আর এই আদব মুস্তাহাব। মুস্তাহাবটা দৈনিক আমল না করলে না করলাম। যেমন জামা গায়ে দেওয়ার সময় ডান হাত আগে ঢুকানো এটা মুস্তাহাব। ভুলে বাম হাত আগে ঢুকে গেছে এতে ফরয বা ওয়াজিব লংঘন হয়নি। কিন্তু মুস্তাহাব লংঘন হয়েছে। কিন্তু সওয়াব আছে না এতে? ইচ্ছাকৃত আদব পরিপন্থী কাজ করা কি ভালো? কিন্তু এটা মুস্তাহাব। আপনার জানা তো থাকতে হবে। আপনার জানা না থাকলে সব সময় তো উল্টা করবেন। মসজিদে ঢোকার সময় ডান পা আগে দেওয়া আদব এটা মুস্তাহাব। সুন্নত। ফরয ওয়াজিব নয় কিন্তু জানা তো থাকতে হবে। জানা না থাকলে দেখা যাবে বেশির ভাগই বাম পা আগে যায়। বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বের হয়। এটা কি মুসলিমের জন্য ভালো, সেজন্য অনেকে ধারণা করে যে, এটা তো মুস্তাহাব, এটা তো নফল, না জানলে কী হবে? আরে মুস্তাহব ও নফলের ইলম অর্জন করাও কি শুধু মুস্তাহাবই, না একটি জরুরি কাজ?

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي

তথ্যসূত্র: https://ahlehaqmedia.com/7230/

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিভূমি :

ইসলামের প্রথম যুগেই ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। সেসময় রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের নিকটে কুরআনী নির্দেশনা ব্যাখ্যা করতেন, যেন তারা দ্বীনের আলোয় আলোকিত হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ)-এর এসব মজলিসই পরবর্তী যুগে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মডেল হিসাবে কাজ করেছে। মসজিদে নববীতে নিয়মিত দ্বীনী মজলিস অনুষ্ঠিত হ'ত এবং এটা ইসলামের ইতিহাসে কেবল প্রথম শিক্ষাকেন্দ্রই ছিল না, বরং পরবর্তীতে এটা রীতি হয়ে দাঁড়াল যে, মসজিদগুলি শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেও ব্যবহৃত হবে। ফলে শত শত বছর ধরে যেসব স্থানকে ঘিরে শিক্ষা-কার্যক্রম আবর্তিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে মসজিদই প্রথম স্থান দখল করে রেখেছিল। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) যেরূপ মৌখিকভাবে ছাহাবীদের মাঝে দ্বীনের কথা ব্যাখ্যা করতেন, বা সহজ ভাষায় বললে যে পদ্ধতিতে ছাহাবীগণ তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী আত্মস্থ করতেন, সেটাই পরবর্তীকালে ইলম চর্চার প্রধান মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হয়। যেমন ছাত্রদেরকে শিক্ষকের মুখনিঃসৃত বাণী স্বয়ং শিক্ষকের মুখ থেকে শুনতে হ'ত। এভাবে 'শ্রবণনীতি' (সামা') আত্মপ্রকাশ করল, যার উপর ভর করে সকল ইলমী কার্যক্রম এগিয়ে চলল। স্পষ্ট করে বললে, শ্রবণনীতির দাবী হ'ল যদি কোন নারী বা পুরুষ কোন কথা সরাসরি শিক্ষকের নিকট থেকে না শুনে থাকে, তাহ'লে তা উক্ত শিক্ষকের বরাতে অন্যের নিকট প্রচার করা যাবে না।[1]

হাদীস নিঃসন্দেহে দ্বীনী ইলমের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল এবং এটাই শ্রবণনীতির (সামা') আত্মপ্রকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এটার মূল বক্তব্য হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে শ্রবণ করতে হবে। যেটা অনেকটা স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর মজলিসে হাযির হওয়ার শামিল। প্রথম যুগে হাদীছের ছাত্ররা নিয়মিত ক্লাসে হাযির হয়ে হাদীছ 'শেখার' চেয়ে বিভিন্ন শায়খের নিকট থেকে হাদীছ 'সংগ্রহ করাকে' প্রাধান্য দিতেন। 'সংগ্রহের' বিষয়টি পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয় হাদীছের মজলিসগুলি যতটা না ইলমী উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল দ্বীনী প্রেরণায়। অবশ্য এরই মধ্য দিয়ে ইলমে হাদীছ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে।

ইসলামের প্রথম যুগের শিক্ষা-কার্যক্রম :

ইসলামের প্রথম যুগের শিক্ষা-কার্যক্রম সম্পর্কে, বিশেষ করে এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। খুব সম্ভবত কুরআনের পঠন-পাঠনই ছিল সব ধরনের শিক্ষা উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সে সময় বহু মুসলিম কুরআন হিফয করতেন। সম্ভবত বহুল পরিচিত 'দারুল কুররা'ই হ'ল প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে বদর যুদ্ধের পর মদীনায় হিজরতকালে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম ও মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ) অবস্থান করেছিলেন বলে জানা যায়।[2] এটাও জানা যায় যে, ছুফফাহ, যেটা হ'ল মসজিদে নববীর মধ্যে বারান্দা বিশেষ, তাহ'ল প্রকৃতপক্ষে প্রথম আনুষ্ঠানিক আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেখানে স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে পঠন, লিখন, ফিক্বহ, তাজবীদসহ (কুরআন শুদ্ধরূপে পড়ার নিয়ম-পদ্ধতি) অন্যান্য ইসলামী শাস্ত্রের অধ্যয়ন চলত।[3] ছুফফাহ কোন সুবিন্যস্ত আবাসিক প্রতিষ্ঠান ছিল কি-না, সে প্রশ্ন আপাতত মুলতবী রেখে, রাসূল (ছাঃ) যে তাদের পাঠন কার্যে যথেষ্ট সময় ব্যয় করতেন, এই দাবী অন্তত বেশ জোরের সাথে করা যায়। ছালাত পরবর্তী হালাকা সমূহ, যেগুলি কম-বেশী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল, সেগুলি ছাড়াও ছাহাবীগণ নবী করীম (ছাঃ)-কে মসজিদের ভিতরে এবং বাইরে ঈমান ও আখলাক সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করতেন।[4]

আলোচনার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চারপাশে উপবিষ্ট শ্রোতাদেরকে একটি বিষয় তিন বার করে বলতেন।[5] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন গোত্রের নিকট কুরআনের প্রশিক্ষক পাঠিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে খলীফা ওমর (রাঃ)ও সেই ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন।[6] যাহোক, ইসলামী শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়নকল্পে মদীনায় একটি বিশেষ মজলিস গঠিত হয়েছিল বলে দাবী করা হয়।[7] আরো বলা হয়, হাদীছ প্রচারের উদ্দেশ্যে আহলে ইলমের একটি দল গঠন করা হয়েছিল।[8]

শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ :

মসজিদকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজের জীবন আবর্তিত হ'ত। কারণ মসজিদ ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক তথা সকল কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র। ইবাদতগাহ হওয়া ছাড়াও মসজিদগুলি শত শত বছর ধরে সামাজিক পরিষদের ভূমিকাও পালন করে এসেছে। যেমন বিচারকরা (ক্বাযী) মসজিদের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। কখনো কখনো মসজিদে মুসাফিরদের থাকার ব্যবস্থা করা হ'ত। আবু যাকারিয়া তাবরীযী দামেশকের জামে মসজিদের মিনার সংলগ্ন একটি ছোট্ট কক্ষে থাকতেন।[9] মুসলিম সমাজে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মসজিদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষাকেন্দ্র হওয়ায় মসজিদে নিয়মিত দরস অনুষ্ঠিত হ'ত। আর এভাবে মসজিদ থেকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ত।

একথা সত্য যে, কেবলমাত্র মসজিদই শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না; বরং মসজিদ ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় পাঠদান সম্পন্ন হ'ত। পঠন-পাঠনের নিমিত্তে বিশেষ ভবন নির্মাণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আবুবকর মুহাম্মাদ বিন বাশশার বছরী আল-বুনদার (মৃ. ২৫২ হিঃ) তার ছাত্র ইবনে খাররাশ (মৃ. ২৮৩ হিঃ)-এর নিকট হাদীছ বর্ণনার নিমিত্তে একটি কক্ষ নির্মাণের জন্য ২০০০ দিরহাম গচ্ছিত রেখেছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কক্ষ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[10] আলী বিন মুহাম্মাদ আল-বাযযায (মৃ. ৩৩০ হিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, পড়াশোনার জন্য তার একটি বিশেষ গৃহ ছিল (বায়তুল ইলম)।[11] এমনিভাবে আবু হাতেম বুসতী (জন্ম ২৭৭ হিঃ)-এর বিশেষ অবদান হ'ল, তিনি লাইব্রেরী সমৃদ্ধ একটি 'দারুল ইলম' গড়ে তোলেন এবং বহিরাগত ছাত্রদের জন্য বেশ কিছু কক্ষ নির্মাণ করেন। তিনি তাদেরকে নিজ উদ্যোগে ভাতাও দিতেন।[12] নিশাপুরের প্রথমদিকের মাদ্রাসাগুলি শায়খদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[13]

(১) বাসগৃহ :

অনেক সময় শিক্ষকদের নিজস্ব বাসভবন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আবু মুহাম্মাদ সুলায়মান বিন মিহরান আল-আ'মাশের (মৃ. ১৪৮ হিঃ) বাসভবন কূফার অন্যতম বিদ্যাপীঠ ছিল।[14] একজন দরিদ্র ছাত্রকে নিয়ে একটি মজার গল্প চালু আছে। ছাত্রটি টিউশন ফি দিতে না পারায় তার শিক্ষক ইবনে লুলূ (মৃ. ৩৭৭ হিঃ) তাকে দরস থেকে বের হয়ে যেতে বলেন। দরস অনুষ্ঠিত হচ্ছিল শিক্ষকের গৃহে। নিরুপায় হয়ে ছেলেটি ক্লাস থেকে বের হয়ে গেলেও গৃহ সংলগ্ন একটি করিডোরে চুপচাপ বসে পড়ল। এবার যে ছাত্রটি উক্ত দরসে উস্তাযকে কিতাব পড়ে শোনাচ্ছিল, সে তার অসহায় বন্ধুকে সাহায্য করতে চাইল। সে উচ্চৈঃস্বরে পড়তে লাগল যাতে করিডোরে বসা বন্ধুটিও শুনতে পায়।[15]

বাগদাদের একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল 'মজলিসে মাহামিলী'। এটি ২৭০ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মূলতঃ ফিক্বহ ও ধর্মতত্ত্বের উপর আলোচনা হ'ত। মজলিসটি অনুষ্ঠিত হ'ত আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন বিন ইসমাঈল যাববী মাহামিলীর বাসভবনে। প্রতি বুধবার এখানে সভা বসত এবং ৩৩০ হিজরীতে ক্বাযী মাহামিলীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনিই এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন।[16] শায়খদের কাছে বুধবার সম্ভবত পাঠদানের জন্য বিশেষ পসন্দের দিন ছিল।[17] হিজরী ৫ম শতকে বাগদাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিতর্কসভা ছিল ক্বাযী সিমনানীর (মৃ. ৪৪৪ হিঃ) বিতর্কসভা। এটি সিমনানীর গৃহে অনুষ্ঠিত হ'ত।[18] বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আবুল আববাস ছা'লাব (মৃ. ২৯১ হিঃ) বর্ণনা করেন, তিনি ৫০ বছর যাবৎ তার শিক্ষক ইবরাহীম হারবীর (মৃ. ২৮৫ হিঃ) গৃহে অভিধান-সংকলন বিদ্যার ক্লাসে হাযির হয়েছেন।[19] ব্যাকরণবিদ ফার্রা নিজ গৃহে পাঠদান করতেন।[20] আবুবকর বিন সিরাজ নাহবী (মৃ. ৩১৬ হিঃ) সম্পর্কেও এমন কথা বর্ণিত আছে।[21]

(২) দোকান :

যেহেতু অনেক শায়খ ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই তাদের দোকানগুলিতে মাঝে-মধ্যে পাঠদান সম্পন্ন হ'ত। ইলমে ফারায়েযের একজন শিক্ষক সম্পর্কে শোনা যায়, তিনি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে নিজ দোকানে দরস প্রদান করতেন।[22] খত্বীব বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হিঃ) ইবনে ইসহাকের দোকানে জনৈক শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করেছেন।[23] আহমাদ বিন হাম্বল (মৃ. ২৪০ হিঃ) জনৈক তাঁতীর দোকানে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[24] বিভিন্ন যুগে এভাবে পাঠদানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(৩) মসজিদ :

স্বাভাবিকভাবে পঠন-পাঠনের জন্য মসজিদ ছিল সবচেয়ে পসন্দের জায়গা। মুখাওয়াল বর্ণনা করেন, একদা রাসূল (ছাঃ) তাঁর দশজন ছাহাবীকে মসজিদে ক্বোবায় জ্ঞান আহরণে নিয়োজিত দেখতে পেলেন এবং তিনি তাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানালেন।[25] তবে মসজিদ কেন্দ্রিক পঠন-পাঠনের বিষয়টি কমবেশী বড় শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষায়তন খুঁজে পাওয়ার ঘটনা ছিল বিরল। বাগদাদ, দামেশক বা কায়রোর মতো বড় শহরগুলিতে শিক্ষাকেন্দ্র ছিল অগণিত। তাই শহরের ছোট-বড় অসংখ্য মসজিদে পাঠদান চলত।

বড় শহরগুলিতে মসজিদ ছিল দুই ধরনের। একটা হ'ল সাধারণ মসজিদ, যেখানে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত অনুষ্ঠিত হ'ত। অপরটি হ'ল জামে মসজিদ, যেখানে শুক্রবার জুম'আর ছালাতও অনুষ্ঠিত হ'ত। একটি মধ্যম মানের শহরে একাধিক জামে মসজিদ থাকত। উদাহরণস্বরূপ বাগদাদের কথা বলা যায়। হিজরী ৫ম শতকে বাগদাদে ৬টি জামে মসজিদ ছিল এবং বলা হয়ে থাকে, সেসময় পুরো বাগদাদ শহরে মোট মসজিদ ছিল তিন হাযার।[26]

এক একটি মসজিদে সম্ভবত এক বা একাধিক বিষয়ে এক বা একাধিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হ'ত। মসজিদের মুতাওয়াল্লীর নিকট থেকে পঠন-পাঠনের অনুমতি লাভের ক্ষেত্রে শক্ত কোন নিয়ম ছিল বলে মনে হয় না। কারণ অধিকাংশ মসজিদের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ চলত ওয়াকফের মাধ্যমে বা মসজিদের বিষয়াবলী দেখার জন্য একদল কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান থাকত। তবে জামে মসজিদের ক্ষেত্রে এমন বিধিনিষেধের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন খত্বীব বাগদাদী খলীফা কাইয়ূম বিল্লাহর নিকট 'জামে মানছূরে' হাদীছ বর্ণনার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। 'জামে মানছূর' ছিল সেসময় রাজধানীর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এবং একই সাথে এটা সবচেয়ে স্বনামধন্য বিদ্যায়তনও ছিল। খলীফা একবার নাক্বীবে নুক্বাবার নিকট এই মর্মে সুফারিশপত্র লিখলেন যে, তিনি যেন খত্বীব বাগদাদীর পাঠদানে সহযোগিতা করেন। নাক্বীবে নুক্বাবা ছিলেন হাশেমীদের প্রধান রাজকর্মচারী এবং রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধর তথা শরীফদের প্রধান নিবন্ধক। নাক্বীবে নুক্বাবার হয় সেসময় উক্ত মসজিদের তদারকির দায়িত্ব ছিল, নতুবা তিনি উক্ত মসজিদে সুষ্ঠুভাবে পাঠদানের বিষয় দেখাশোনা করতেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, জামে মানছূর ছিল হাম্বলীদের শক্ত ঘাঁটি। অবশেষে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কি-না দেখার জন্য খত্বীব বাগদাদীর প্রথম দরসে স্বয়ং নাক্বীবে নুক্বাবা হাযির হয়েছিলেন।

প্রায়ই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মসজিদে এক বা একাধিক বিষয় চর্চার ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা করতেন। আবার কখনো কখনো একটি মসজিদ বিশেষ কোন ইলম অধ্যয়নের জন্য পরিচিতি লাভ করত। এটা হ'ত সেখানে দরস প্রদানকারী শায়খদের খ্যাতির কারণে। এসব ক্ষেত্রে কখনো আবার পাঠদানকারী শায়খদের নামে মসজিদের নামকরণ হয়ে যেত। যেমন কুরআনের বিখ্যাত ক্বারী রুওয়াইম বিন ইয়াযীদের (মৃ. ২১১ হিঃ) নামে একটি মসজিদের নামকরণ করা হয়েছিল। মসজিদটি বাগদাদের দারবে কাল্লাঈন এলাকায় অবস্থিত ছিল।[27] ৩৭৪ হিজরীতে যখন আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আত-তাম্মার সেখানে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তখনও মসজিদটি উক্ত নামে পরিচিত ছিল।[28] বাগদাদের আরেকটি মসজিদের নামকরণ করা হয়েছিল আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের (মৃ. ১৮১ হিঃ) নামে। তিনি যদিও বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন না, তবে তিনি হয়ত তার বিভিন্ন সময় বাগদাদ সফরে সেখানে দরস প্রদান করেছেন। হিজরী ৫ম শতকে যখন শাফেঈ মাযহাবের বিখ্যাত ফক্বীহ আবু হামেদ ইসফারায়ীনী (মৃ.

৪০৬ হিঃ) সেখানে দরস প্রদান করছিলেন, তখনও মসজিদটি উক্ত নামেই পরিচিত ছিল। ততদিনে মসজিদটি একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং সাথে সাথে এটি বাগদাদের একটি আকর্ষণীয় স্থান হিসাবেও গণ্য হ'ত। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হ'তে আগত শিক্ষার্থীবৃন্দ ইসফারায়ীনীর দরসে অংশগ্রহণ করার জন্য ভিড় জমাত। খত্বীব বাগদাদীর নিকট খবর পৌঁছেছে যে, সেখানে ৭০০ ছাত্র দরস গ্রহণ করত।[29] এভাবে মসজিদগুলি শত শত বছর ধরে বিদ্যাপীঠের ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি আলাদা ভবনসমৃদ্ধ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পরও। অবশ্য প্রতিটি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে একটি করে মসজিদ থাকত।

ইলমী সমাবেশ, মজলিস এবং হালাকা :

ইলমী বৈঠকগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য যে পরিভাষাটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হ'ত, তাহ'ল 'মজলিস'। অবশ্য শব্দটি আরো বেশ কিছু অর্থে ব্যবহৃত হ'তে পারে। যেমন পাঠদানের হল, দরস, শিক্ষকের আসন, পিলার বা চেয়ার সংলগ্ন স্থান বা ভবনের যেকোন জায়গা। পরিপূরক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যোগ করার মাধ্যমে একটি মজলিসের উদ্দেশ্য নির্ণীত হ'ত। যেমন 'মজলিসে তাদরীস' তথা পাঠদানের সভা, 'মজলিসে শু'আরা' তথা কবিদের সভা ইত্যাদি।

যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে একটি মজলিস অনুষ্ঠিত হ'ত, হয়ত তার নামেই মজলিসের নামকরণ করা হ'ত। উদাহরণস্বরূপ 'মজলিসে মাহামিলীর' কথা বলা যায়। এটি মাহামিলীর বাসগৃহে অনুষ্ঠিত হ'ত এবং এখানে মূলত ফিক্বহ ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হ'ত। মজলিসে শাফেঈ বাগদাদের জামে মানছূরে অনুষ্ঠিত হ'ত।[30] উপরোল্লেখিত দু'টি মজলিসই শায়খদ্বয়ের মৃত্যুর বহু পরেও স্ব স্ব নামে পরিচিত ছিল। আসলে মজলিসগুলি প্রতিষ্ঠাতাদের নামে একাডেমিক চেয়ার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের স্মৃতি জাগরুক রাখত। সেসব চেয়ারে পরবর্তীতে বিখ্যাত শায়খদের নিয়োগ দেয়া হ'ত। যাহোক, খত্বীব বাগদাদীর জীবদ্দশায়ও মজলিসে মাহামিলী বিদ্যমান ছিল এবং তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলেও উল্লেখ করেছেন।[31]

ইলমী বৈঠকগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য দ্বিতীয় যে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হ'ত, সেটি হ'ল 'হালাকা' (পাঠচক্র)। দরসে সুবিন্যস্তভাবে বসার ধারণা হ'তে সম্ভবত শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ছাত্ররা চারদিকে গোল হয়ে বসত, তবে শিক্ষকের সম্মুখভাগে বসা পসন্দনীয় ছিল। যদিও মজলিসের মতো সব ধরনের ইলমী বৈঠক বুঝাতে 'হালাকা'র প্রয়োগ করা যায়। তবুও এটার ব্যবহার বোধহয় সীমিত সংখ্যক ছাত্র নিয়ে নিয়মিতভাবে ক্লাস করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। এটি বিশেষত ভাষাবিজ্ঞান ও অন্য বেশকিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলিতে ছাত্রদেরকে মোটামুটি লম্বা সময় ধরে একজন শিক্ষকের অধীনে পড়াশোনা করতে হ'ত। 'হালাকায়ে খলীল নাহবী' (মৃ. ১৭৪ হিঃ) এ ধরনের হালাকার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। খলীলের মৃত্যুর পর তার ছাত্র ইউনুস নাহবী এই হালাকার হাল ধরেন।[32]

মনে করা হয়, জামে মসজিদে যে দরস অনুষ্ঠিত হ'ত, তাকে হালাকা বলা হ'ত এবং একটি জামে মসজিদে অনেকগুলি করে হালাকা বসত। প্রত্যেকটি হালাকায় একজন করে শিক্ষক থাকতেন।[33] ইমাম শাফেঈ যখন বাগদাদ সফর করেন, তখন জামে মানছূরে ৪০-৫০টির মত হালাকা ছিল বলে উল্লেখিত হয়েছে।[34] ৩২৬ হিজরীতে কায়রোর জামে আমরে মালেকী মাযহাবের ১৫টি, শাফেঈ মাযহাবের ১৪টি এবং হানাফী মাযহাবের ৩টি করে হালাকা ছিল।[35] কায়রো ও দামেশকে নিয়মিত বৈঠকগুলিকে 'আয-যাবিয়া' বলা হ'ত। যাবিয়াতে শাফেঈ', যেখানে তিনি সশরীরে দরস দিয়েছেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উক্ত নামে পরিচিত ছিল। কায়রোর মসজিদে আযহার এবং জামে মামূর, যেটাকে দামেশকের গ্র্যান্ড মসজিদও বলা হয়, উভয়টিতে আটটি করে 'যাবিয়া' ছিল।

হাম্বলী মাযহাবের বিখ্যাত ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছ আবুবকর নাজ্জাদ (মৃ. ৩৪৮ হিঃ) জামে মানছূরে দু'টি হালাকার আয়োজন করতেন। শুক্রবার জুম'আর ছালাতের পূর্বে ফিক্বহী মাসআলার জন্য একটি, আর অপরটি জুম'আর পর হাদীছ বর্ণনার জন্য।[36] একই শহরের জামে রুসাফাতে হাদীছের ছাত্রদের আরেকটি হালাকা বসত।[37] আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন আহমাদ মারওয়াযীও (মৃ. ৩৪০ হিঃ) জামে মানছূরে একটি হালাকার আয়োজন করতেন। বিখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আশ'আরী (মৃ. ৩৩০ হিঃ) এখানে প্রতি শুক্রবার দরস দিতেন।[38] আসলে একটি হালাকাতে কয়েকজন উস্তায দরস দিতেন, আবার এটাও সম্ভব যে কয়েকজন উস্তায কয়েকটি আলাদা আলাদা হালাকায় অংশগ্রহণ করতেন। মজলিস ও হালাকার মধ্যে পার্থক্য ছিল বটে, তবে উভয়েরই মৃত শিক্ষকের নামে চেয়ার ছিল।

ছাত্রদের জন্য সাধারণত সব দরস উন্মুক্ত ছিল। তবে ব্যতিক্রম হ'ত সেসব বিষয়ে যেগুলি শিখতে দীর্ঘ সময় লাগত। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে কিছু ছাত্রকে বাছাই করতেন এবং তাদেরকে দরসে বসার অনুমতি দিতেন। আর যে বিষয় শেখানো হচ্ছে, সে অনুযায়ী ক্লাসের আকার ছোট বড় হ'ত। ফলে ফিক্বহ বা ব্যাকরণের ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ছিল খুব সীমিত। কিন্তু হাদীছের ক্লাসগুলিতে উপস্থিতির সংখ্যা মাঝে-মধ্যে এত বেশী হ'ত যে, হাদীছ বর্ণনার জন্য শিক্ষককে বর্ণনা-সহকারী (মুসতামলী) নিয়োগ করতে হ'ত। যিনি শিক্ষকের বলা কথা একদম পেছনের সারিগুলির উদ্দেশ্য আবার বলতেন, যেখান থেকে হয়ত শিক্ষকের কথা ঠিকমতো শোনা যায়নি। কায়রোর জামে আমরে আবুবকর নি'আলীর (মৃ. ৩৮০ হিঃ) হালাকা এত বড় ছিল যে, মসজিদের সতেরোটি স্তম্ভ জুড়ে ছাত্ররা বসত।[39] মুসতামলীর কাজ ছিল উস্তায বর্ণিত অংশটুকু পুনরায় বলা যাতে উপস্থিত প্রত্যেকে তা লিখে নিতে পারে।[40]

মুসতামলীর দায়িত্ব ছিল শিক্ষকের বলা অংশটুকু কোন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি ছাড়াই পুনরাবৃত্তি করা। একজন মুসতামলীর ব্যাপারে জানা যায়, পুনরাবৃত্তির সময় ভুল করার কারণে উস্তায তাকে তিরস্কার করেন এবং নির্ভুলভাবে বর্ণনার জন্য নছীহত করেন।[41] প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ সিবাওয়াইহ (মৃ. ১৯৪ হিঃ) সম্পর্কেও এমন কথা শোনা যায়। তিনি প্রথম জীবনে একজন মুসতামলী ছিলেন। একবার একটি হাদীছের ক্লাসে পুনরাবৃত্তির সময় ব্যাকরণগত ভুল করায় পরবর্তীতে তিনি তার গবেষণার ক্ষেত্র বদলে ফেলেন।[42] এমন আরেকটি ঘটনা হ'ল, একবার একটি বড় দরসে তিনজন মুসতামলী নিযুক্ত করার পরও ছাত্ররা ঠিকমতো পড়া শুনতে পাচ্ছিল না। ফলে প্রখ্যাত মুসতামলী হারূন বিন সুফিয়ান আদ-দীককে ডাকা হয়। তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠের অধিকারী এবং তিনি কাজটি পুরোপুরি একাই করতেন।[43] এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়, মুসতামলীর কাজটি একটি উল্লেখযোগ্য পেশায় পরিণত হয়েছিল।[44] কতিপয় শিক্ষক বহু বছর যাবৎ ব্যক্তিগত মুসতামলী রাখার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।[45]

মুসতামলী সাধারণত ক্লাসের মাঝখানে দাঁড়াতেন বা উঁচু আসনে বসতেন। যাতে প্রত্যেকে তাকে দেখতে ও শুনতে পায়। উস্তাযকে দরস শুরু করতে বলার পূর্বে মুসতামলী শিক্ষকের নাম, উপনাম ও বংশপদবী বলে নিতেন। মুসতামলীরা সম্ভবত আগেভাগে কিছু বিষয় নোট করে রাখতেন। কারণ ক্লাস শেষ হওয়ার পূর্বেই সম্পূর্ণ পাঠ তাদেরকে পুনরায় বলতে হ'ত।[46] একইভাবে একেকটি শাস্ত্র শেষ করতে একেক রকম সময় লাগত। উদাহরণস্বরূপ হাদীছের কথা বলা যায়। হাদীছের ছাত্ররা বছরের পর বছর ধরে এক জায়গা হ'তে আরেক জায়গায়,[47] এক শিক্ষক হ'তে আরেক শিক্ষকের নিকট যাতায়াত করত। এভাবে হাদীছ সংগ্রহ করে সেগুলি যাচাই-বাছাই করার পর একত্রে সংকলন করত।[48] একজন শিক্ষক একবার আফসোস করে বললেন যে, তার ছাত্ররা মাত্র চার পাঁচ মাসের দরসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অথচ তার সংকলনটি সম্পূর্ণ করতে চল্লিশ বছর লেগেছে।[49] হাদীছের পাঠ সম্পন্ন করার নির্ধারিত কোন বয়স ছিল না। ছাত্ররা দীর্ঘ সময় ধরে সংকলনকার্য চালিয়ে যাবে নাকি আগেভাগে বন্ধ করে দেবে, তা নির্ভর করত তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর। এক ছাত্রকে নিয়ে একটি মজার গল্প আছে। একবার যখন সে একটি বাজারের মধ্য দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছিল, তখন একটি লোক তার গতিরোধ করল। লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি হাদীছের ছাত্র? ছাত্রটি অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি হাদীছের ছাত্র। কিন্তু আপনি কিভাবে জানলেন?' লোকটি উত্তর দিল, 'আহমাদ বিন হাম্বল বলতেন, তুমি যদি কাউকে রাস্তা দিয়ে ছুটতে দেখো, তাহ'লে নিশ্চিত জানবে সে হয় পাগল, না হয় হাদীছের ছাত্র'।[50] আহমাদ বিন

হাম্বল নিজেও একদিন এক লোকের সামনে পড়েছিলেন, যখন তিনি পরবর্তী ক্লাসে সময়মত শরীক হওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছিলেন। লোকটি তাকে বলল, 'এভাবে ছুটতে কি তোমার লজ্জা লাগে না? আর কতদিন তুমি এভাবে বাচ্চাদের সাথে দৌড়াবে বলে নিয়ত করেছ?' ইবনু হাম্বল উত্তর দিলেন, 'মৃত্যু পর্যন্ত'।[51]

তবে কতিপয় শাস্ত্রের ক্ষেত্রে ভিন্নতর চিত্র দেখা যেত। ভাষাবিজ্ঞান ও ফিক্বহের ছাত্ররা একজন নির্দিষ্ট শিক্ষকের অধীনে বেশ লম্বা সময় ধরে পাঠগ্রহণ করত। কথিত আছে, আহমাদ বিন ইয়াহইয়া ছা'লাবের (মৃ. ২৯১ হিঃ) অন্যতম শিষ্য আবু মূসা আল-হামেয তাঁর নিকট ৪০ বছর ধরে ইলম অর্জন করেছিলেন।[52] তাফসীরের একজন শিক্ষক ছয় বছর ধরে তার কিতাবের দরস দিতেন।[53]

প্রখ্যাত হানাফী ফক্বীহ আবু ইউসুফ (মৃ. ১৮২ হিঃ) সতেরো বছর ধরে তার উস্তায আবু হানীফার দরসে বসেছেন।[54] আবু হানীফা নিজেও দশ বছর যাবৎ তার উস্তায হাম্মাদ বিন আবু সুলায়মানের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।[55] অবশেষে যেসময় বাগদাদ ও অন্যান্য জায়গায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হ'ল, ততদিনে ফিক্বহ শাস্ত্র চার বছরের একটি মানসম্মত কোর্সের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

মাদ্রাসা-পূর্ব যুগের শিক্ষাব্যবস্থা এমন ছিল যে, সেখানে ছাত্র শিক্ষক কারো জন্য কোন বয়সসীমা ছিল না। একজন যতদিন চাইত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারত। আবার যখন সে নিজেকে যোগ্য বলে মনে করত এবং ছাত্ররা তাকে উস্তায হিসাবে গ্রহণ করত, তখন সে দরস দেয়া শুরু করত। ১৭ বছরের এক তরুণ হাদীছ বর্ণনার জন্য মজলিসের আয়োজন করেছিল।[56] আরেকজনের বয়স ছিল ১৮, যখন হাদীছের ছাত্ররা তাকে দরস প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছিল।[57] তবে এটা সাধারণ চিত্র ছিল না। ওয়াক্বী' ইবনুল জার্রাহ (মৃ. ১৯৮ হিঃ) ৩৩ বছর বয়সে হাদীছ বর্ণনা করা শুরু করেন। এমনিভাবে ইবনে মাহদী যখন প্রথমবার পাঠদান করেন, তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশও হয়নি।[58] [ক্রমশঃ]

মূল (ইংরেজী): মুনীরুদ্দীন আহমাদ

মুনীরুদ্দীন আহমাদ (মুনীর ডি আহমাদ) : (১৯৩৪-২০১৯) একজন পাকিস্তানী লেখক ও গবেষক। তিনি ১৯৩৪ সালে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডীতে জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে পড়ালেখা করেছেন। পরবর্তীতে জার্মানীর হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যয়ন করেন এবং এখান থেকে ১৯৬৭ সালে খত্বীব বাগদাদীর 'তারীখে বাগদাদ'-এর উপর পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর উক্ত বিশ্বিবদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনাও করেন। ২০১৯ সালের ২১শে এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর লিখিত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ হ'ল, 'Muslim education prior to the establishment of Madrasah'। যা ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলামিক স্টাডিজ' পত্রিকায় ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব

শিক্ষার্থী, ইংরেজী বিভাগ, ২য় বর্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তথ্যসূত্র: https://at-tahreek.com/article_details/9850

অনলাইনে পড়াশোনাঃ কিছু মৌলিক কথা



প্রযুক্তির উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে মানুষের পড়াশুনার গতি-প্রকৃতিতে নানাবিধ পরিবর্তন এসে হানা দিয়েছে। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। শতাব্দীকাল ধরেই সময়ের স্রোত বেয়ে শিক্ষার মতিগতিতে সবসময়ই কিছু না কিছু পরিবর্তন এসেছে। কিছু সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন হয়েছে। বিগত দশকের শেষ ভাগে করোনার আগমনের মধ্য দিয়ে পুরো পৃথিবীতে অনলাইন শিক্ষা বেশ পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়েছে। এই বিষয়ে কিছু মৌলিক কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছি পাঠকের সমীপে।

অফলাইনে পড়া অনলাইন থেকে উত্তম

সাধারণ অবস্থায় সরাসরি উস্তাযের কাছে পড়াশোনা সবসময়ই অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠ। এটি একটি দিবালোকের ন্যায় বাস্তবতা, যা অস্বীকারের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। সরাসরি কারো কাছে পড়লে কলবে এর যে প্রভাব পড়ে থাকে, তা অনলাইনে ওই মাত্রায় হয় না। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, লাইসাল খবারু কাল মুআয়ানাহ। অর্থাৎ, দেখা জিনিস কখনোই শোনা জিনিসের মত নয়। দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে। সেজন্য অফলাইনে পড়ার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকলে অফলাইনেই সরাসরি পড়া উচিত। তবে যাদের সেই সুযোগ নেই তারা অনলাইনে পড়ার সুযোগটা গ্রহণ করে নিতে পারেন।

প্রসঙ্গত এখানে একটা নীতির কথা বলে রাখি। এটি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে আশা করছি। এটিও মূলত একটি আরবী প্রবাদ থেকে গৃহীত – মা লা ইউদরাকু কুল্লুহু, লা য়ুতরাকু কুল্লুহু। অর্থাৎ, যার সবটা নেওয়া যাচ্ছে না, তার পুরোটাই ছেড়ে দেওয়াও উচিত নয়। বরং যতটুকু পারা যায়, ততটুকুই গ্রহণ করে নেওয়া। বাংলাতে এর কাছাকাছি প্রবাদ হলো, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। অনলাইন-অফলাইন কোথাও কোন কিছু না শেখা হলো নাই মামা, আর শুধু অনলাইনে শেখা কানা মামা। অফলাইনে সরাসরি উস্তাযের সামনে হাঁট গেড়ে বসা হলো ভাল মামা।

অনলাইনে পড়াশোনা দু'টি ধরণ

অনলাইনে পড়াশোনার দু'টি ধরণ আছে। প্রথম হলো, নিজের মত যা খুশি ও যেভাবে খুশি সেভাবে অধ্যয়ন করা। বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত টিউটোরিয়াল দেখে নিজের মতো কিছু শেখা বা বুঝে নেওয়া। ইলম চর্চার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ঝুঁকিপূর্ণ।

দ্বিতীয় হলো, কোন যোগ্য উস্তাযের তত্ত্বাবধানে থেকে তার দিকনির্দেশনা মেনে পড়াশোনা করা। এই পদ্ধতি প্রথম ধরনের মত ঝুঁকিপূর্ণ নয়। এর মানও খারাপ নয়। বরং এভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়লে একজন ছাত্র অফলাইনে সরাসরি যারা পড়েছে, তাদের অনেকের থেকেও ক্ষেত্রবিশেষ ভাল যোগ্যতাসম্পন্ন হয়। এটি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আমি যাদেরকে এসো আরবি শিখি পুরোটা পড়িয়ে শেষ করেছি, তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে আলহামদুলিল্লাহ।

অনলাইনে দারসের সাথে অফলাইনের মাদরাসাগুলোর কিছু চিত্রের সাথে মিলে যায়। দু'য়ের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান থাকে না। যেমন, কিছু মাদরাসায় ছেলেদের সামনে উস্তায সরাসরি বসে পড়ান আর মেয়েদের ওখানে শুধু স্পিকার সেট করা থাকে। তারা শুনে শুনে সবক ধরে। অনেক

মহিলা মাদরাসায় উস্তাযের বসার জায়গা আর মেয়েদের দরসগাহ থাকে আলাদা। স্পিকারের মাধ্যমে তার আওয়াজটুকু শুধু তাদের কাছে পৌঁছে এবং এভাবেই তারা সবক ধরে। কেউ কাউকে দেখে না। অনেক ছোট রুমের ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা বেশি হলে কিছু ছাত্র বসে এক রুমে, যেখানে উস্তায তাদের সামনে থাকে আর কিছু ছাত্র বসে অন্যরুমে, যেখান থেকে উস্তাযকে তারা দেখে না; শুধু কথাটুকু শুনে। এরকম খুঁজলে আরো কিছু চিত্র পাওয়া যাবে। এই চিত্রগুলোর সাথে অনলাইনের দারসের খুব বেশি একটা পার্থক্য নেই।

উস্তায নির্ধারণে সতর্কতা

অনলাইন বা অফলাইন, যেখানেই পড়েন না কেন, উস্তায নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু অনলাইনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব তুলনামূলক বেশি। কেননা অনলাইনে উস্তায সরাসরি সামনে থাকেন না। ফলে এক্ষেত্রে ধোঁকা খাওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে।

সালাফে সালেহীনের থেকে একটি উপদেশ পাওয়া যায়-এই ইলম দ্বীনের অংশ। সুতরাং কার থেকে ইলম নিচ্ছেন, তা খেয়াল করবেন।[1] সুতরাং যার কাছ থেকে ইলম নিতে চাচ্ছেন, তার বিষয়ে আগে ভাল করে জেনে নিবেন। তিনি কোথায় পড়াশুনা করেছেন, কাদের কাছে পড়েছেন ইত্যাদি। যার কোনো উস্তায নেই, নিজে নিজে বইপত্র পড়ে ইলম অর্জন করেছে, তার থেকে ইলম গ্রহণ না করা উচিত। কারণ উস্তায ছাড়া এভাবে ইলম শিখলে তাতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি থাকে। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রাহ. বলেন, 'ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; শুধু বই-পুস্তক থেকে নয়।'[2]

একটি ভুল পন্থা

অনলাইনে যারা পড়াশুনা করে তাদের অনেকে একটি ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করে। যার কারণে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। তা হলো, একসাথে একাধিক কোর্সে অংশগ্রহণ করা। এতে করে কোনটাই ভাল মত শেখা হয় না। সেজন্য উচিত হলো, একটা একটা করে সামনে আগানো। মনে রাখবেন, ইলমের পথ হলো ধীরেসুস্থে চলার পথ। যদি তাড়াহুড়া করা হয়, তাহলে অল্পতে ক্লান্তি ও বিরক্তি ভর করার দরুন সেই পথ পাড়ি দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে যায়।

আদবের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা

যারা অনলাইনে পড়াশুনা করে, তাদের ব্যাপারে অনেক সময় আদবের কমতির অভিযোগ শোনা যায়। এদিকটাতেও লক্ষ্য রাখা উচিত। মনে রাখতে হবে, সালাফগণ ইলম শেখার আগে আদব শেখার কথা বলেছেন। ইলমের পরিমাণের চেয়ে আদবের পরিমাণ বেশি হবার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বিখ্যাত ইমাম মালিক ইবনু আনাস রহ. কুরাইশ বংশধর জনৈক যুবককে বলেছেন, 'ইলম শিখার আগে আদব বা শিষ্টাচার শিখো।'[3]

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক রহ. বলেছেন, 'হাদীসের কিতাব অধ্যয়নের চেয়ে আদব অর্জনের প্রয়োজন বেশি।'[4]

সালাফের যামানায় বহু তালিবুল ইলম দারসে অংশ নিতেন শুধু আদব-কায়দা সম্পর্কে অবগত হবার জন্য। প্রখ্যাত আলেম ইসমাইল ইবনু উলাইয়্যাহ রহ. বলেছেন, 'ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. এর দারসে অসংখ্য ছাত্র উপস্থিত হতো। তাদের মধ্যে পাঁচশো ছাত্র হাদীস লেখত আর অবশিষ্ট ছাত্ররা তাঁর থেকে আদব বা শিষ্টাচার শিখত।'[5]

একটি শঙ্কা ও তার প্রতিকার

অনলাইনে যারা কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনা করেন, তারা প্রায় সবাই জেনারেল শিক্ষিত। এক্ষেত্রে একটা আশঙ্কা থাকে যে, তারা অল্প কিছু পড়েই নিজেদের আলেম মনে করে ফেলেন কিনা! বা শরীয়াহর বিভিন্ন বিষয়ে ভুল-ভাল ব্যাখ্যা করা শুরু করেন কিনা! তো এই বিষয়টি উস্তাযদের সচেতনার মাধ্যমে প্রতিহত করা সম্ভব। শিক্ষার্থীদের মগজে বারবার বলার মাধ্যমে এই বিষয়টা গেঁথে দিতে হবে যে, তারা কেবলই প্রাথমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থী। উলুমে শরীয়াহর গভীর জ্ঞান অর্জন দূর কি বাত, তারা এখনো এর গভীরতা অবলোকের ধারেকাছেও যেতে পারেনি। সুতরাং একটু পড়েই যেন নিজেকে 'মুই কিছু হনু রে' মনে করে না ফেলে। এটা শুধু অনলাইনে না; বরং অফলাইনে যারা ব্যক্তিগতভাবে কোন শিক্ষকের কাছে বা কোন মাদরাসায় পড়ছে সবার জন্যই সমান জরুরি। কারণ এই আশঙ্কা সকলের থেকেই সমানভাবে থাকে।

শিক্ষার্থীদের জন্য এক্ষেত্রে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা জরুরী মনে করছি। তা হলো, ফতোয়া প্রদান করা বা দ্বীনী মাসআলাগত বিষয়ে কথা বলা খুবই গুরুতর কাজ। কেননা ভুল হলে এর পুরো দায় সেই ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে। হাদীসে এসেছে, যদি কেউ না জেনে আন্দাযি ফতোয়া দেয় তাহলে এর কারণে যে গুনাহ হবে তা ফতোয়াদাতার উপর বর্তাবে।[6]

তাছাড়া কুরআনেও বলা হয়েছে, 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।'[7] এসব কারণে সালাফে সালেহীন ফতোয়া প্রদানের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতেন। সম্ভব হলে নিজে তা এড়িয়ে গিয়ে অন্যকে দেখিয়ে দিতেন।

তাবিয়ী ইবনে লায়লা রহ. বলেন, আমি ১২০ জন আনসারী সাহাবীদের সাক্ষাত লাভ করেছি, তাঁদের কারও নিকট যখন মাসআলা পেশ করা হত, তখন তিনি আরেকজনের কাছে সেটা পাঠাতেন। অতঃপর তিনি আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে বলতেন, এভাবে অবশেষে প্রথমে যার নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার নিকট ফিরে আসত।[8]

বিখ্যাত মুজতাহিদ ফকীহ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের সকল প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং সকল বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করে সে অবশ্যই পাগল।' এমন বক্তব্য অন্য আরেকজন বিশিষ্ট ফকীহ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকেও বর্ণিত আছে।[9]

তবে এর মানে এই না যে, তারা প্রয়োজনের সময়ও মাসআলা জানা থাকলে তা বলতেন না। হযরত সুফয়ান সাওরী রহ. বলেন, 'আমি এমন ফকীহদেরকে পেয়েছি, যারা মাসআলা ও ফতোয়া প্রদান করতে অপছন্দ করতেন। নিতান্ত নিরূপায় হলে তারা ফতোয়া প্রদান করতেন। ফতোয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক জ্ঞাত সেই ব্যক্তি, যে চুপ থাকে, আর এক্ষেত্রে যে অধিক কথা বলে, সে হল চরম মূর্খ।'[10]

মূলত মানুষের ইলম যখন কম থাকে, তখন সে ফতোয়া প্রদানের প্রতি খুব আগ্রহবোধ করে। ইলম যত বারতে থাকে, এই প্রবণতা কমতে থাকে। কেননা তখন এর গুরুতরতা তার বুঝে আসে। ইবনুল কাইয়্যিম রাহ. বলেছেন, 'ফতোয়া প্রদান করতে উদ্যত হওয়াটা কম ইলমের কারণেও হতে পারে আবার অধিক ইলমের কারণেও হতে পারে। অতএব যখন কারও ইলম কম থাকে, তখন তাকে যে বিষয়েই প্রশ্ন করা হয়, না জেনে সে সকল বিষয়ে সমাধান দেয়।'[11]

তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে ফতোয়া দেয়ার যোগ্য না হয়েও ফতোয়া প্রদান করল, সে গোনাহগার ও আল্লাহর অবাধ্য।'[12]

সুতরাং অনলাইনে কিছু দিন পড়ার পরই ফতোয়া দেওয়ার মত বিপদসঙ্কুল পথে না নামা। এটা বিশেষভাবে খেয়াল রাখা উচিত।

[1] এটি বিখ্যাত তাবেয়ী ইবনে সীরিন রাহ.সহ আরো অনেকের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

[2] আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ : ২/১৯৩

[3] হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৬/৩৩০

[4] আল-জামি লি আখলাকির রাওয়ী : ১/৮০

[5] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/৩১৬

[6] আবু দাউদ: ৩৬৫৭

[7] সুরা ইসরা : ৩৬

[8] ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন, ইবনুল কাইয়িম : ৪/১৬৮

[9] [9] ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন, ইবনুল কাইয়িম : ১/২৮

[10] আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ, আল্লামা ইবনে মুফলিহ : ২/৬৬

[11] ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন, ইবনুল কাইয়িম : ১/২৮

[12] ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন, ইবনুল কাইয়িম : ৪/১৬৬

তথ্যসূত্র: https://nlquran.com/011036594-2/

উপসংহার:

বর্তমান সমাজ প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে কুশিক্ষার দিকে ধাপমান। সন্তান পিতা-মাতাকে, পিতা-মাতা সন্তানকে, ছোট ভাই বড় ভাইকে, এক মুসলিম অপর মুসলিমকে অপমান-অপদস্ত করতে সামান্য পরিমাণ দ্বিধাবোধ করে না। মুসলিমরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে প্রতিটি জায়গায় নিপীড়নের শিকার। পৃথিবীতে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। এর প্রকৃত কারণ প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া। তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যদি প্রকৃত শিক্ষা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে সমন্বয় করা হয় তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে গোটা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই আসুন! অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করে দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি এবং আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

Assignment Prepared by
Afrin Alam Momo
Batch 202
Roll No:20202115
Islamic Online Madrasah
Address:Raipur,Lakshmipur
Phone:01741463501
Email:afrinmomo99@gmail.com